হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ.-এর দ্বীনী সংস্কার

ইকমালুস সুন্নাহ

মুফতী মনসূরুল হক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
www.darsemansoor.com
Email: darsemansoor.com@gmail.com

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

প্রথম সংস্করণ: যিলহজ্জ ১৪৩৮ হিজরী

ইকমালুস সুন্নাহ

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল মানসূর

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার,
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯১৪৭৩৫৬১৫

মাকতাবাতুল হেরা
৮২/১২এ, উত্তর
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
০১৯৬১৪৬৭১৮১

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সংকলকের কথা

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ’ বছর আগে। মক্কার হেরা গুহায় জ্বলে উঠলো একটি আলো। হেদায়াতের আলো। সে আলোয় কল্পনার চেয়েও কম সময়ে আলোকিত হলো মক্কার চারধার। তারপর খুব দ্রুতই আলোকিত হতে লাগলো সারা বিশ্ব। আরব থেকে কত দূরে এই বাংলা! এখানেও ইসলামের আলো পৌঁছে গেলো সাহাবায়ে কিরামের যুগেই।

ইসলামের স্বার্থক এ জাগরণ এমনিতেই হয়ে যায়নি। এর পেছনে রয়েছে বহু মনীষীর বিনিদ্র রজনী, দা’ঈদের আত্মত্যাগ আর আকাবিরদের কুরবানী। এঁদের সফল সাধনার কারণেই আজ ইসলাম এতটা সুবিন্যস্ত, কালোত্তীর্ণ। মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান ও সমাধান। এ কারণেই ইসলাম সবসময়ই যুগোপযোগী।

কিন্তু ইসলামকে সাড়ে চৌদ্দশ’ বছরের পুরনো বলে এর আদর্শকে মানতে নারাজ কেউ কেউ। তারা বলে, উটের যুগের ইসলাম রকেটের যুগে চলতে পারে না। আশ্চর্য লাগে! ইসলামে কি শুধু উটের যুগের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে? অথবা শুধু উটকেই বাহন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মতো সংকীর্ণতা রয়েছে? তাতো নয়। বরং ইসলামে যেমন উটের পিঠে নামায পড়ার বিধান রয়েছে, ঠিক তেমনি রকেটে কিভাবে নামায পড়তে হবে তাও বলা হয়েছে। বাহন হিসেবে যেমন উটকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি প্লেন আর রকেটকেও বৈধ কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়নি। তাহলে বলুন, এতটা সার্বজনীন, প্রান্তিকতামুক্ত একটি ধর্মকে শুধু উটের যুগের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলা কতটা যুক্তিযুক্ত?

পাঠক! সাড়ে চৌদ্দশ’ বছরের এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েও ইসলামের এতটা সার্বজনীন থাকার কারণ হচ্ছে, আমাদের আকাবিররা দ্বীনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন, পরবর্তীদের জন্য একে আগলে রেখেছেন আমৃত্যু। আমরা আমাদের নিকট অতীতের দিকেই তাকাইনা কেন। এ উপমহাদেশের মানুষের জন্য হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. ছিলেন একজন সফল সংস্কারক, আত্মার চিকিৎসক। তাঁর রূহানী ফয়েযে শুধু তাঁর যুগের মানুষই উপকৃত হয়েছে এমনটি নয়। বরং সে ফয়েয ও বরকত সমকালকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেছে কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগে। আমার শাইখ মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ শাহ আবরারুল হক (হারদুয়ী হুযূর) রহ. ছিলেন হযরত থানবী রহ.-এর ইলমী আলোর সর্বশেষ কাসেদ। ঘরে ঘরে তিনি জ্বেলে দিতে চেষ্টা করেছেন সুন্নাতের মশাল। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ উপমহাদেশের

মসজিদ মাহফিলে সুন্নাত চর্চার হারানো ঐতিহ্য ফিরে এসেছে। চেতনা জেগে উঠেছে সবার মাঝে।

দ্বীনী সংস্কারের কাজে হযরত হারদুয়ী হুযূরের বিশেষ একটি পদ্ধতি ছিলো, সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে জরুরী হেদায়াত সম্বলিত পরচা তৈরি করে বিতরণ করা। দ্বীনী খেদমতের ব্যাপারে হযরতের এ স্বতন্ত্র ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। সে ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু পরচার সন্নিবেশে ইতোমধ্যে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশও পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। **'আ'মালুস সুন্নাহ'** ও **'ইশা'আতুস সুন্নাহ'** নামের সে দু'টি গ্রন্থের পর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সে সারির তৃতীয় গ্রন্থ।

বরাবরের মতো এ গ্রন্থেও স্থান পাচ্ছে আকাইদ, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক সম্পর্কিত চব্বিশটি প্রবন্ধ। সেই সাথে দা'ওয়াত সম্পর্কিত দু'টি প্রবন্ধও একে সমৃদ্ধ করেছে।

এ বইয়ের সংকলনে সর্বক্ষেত্রে হয়তো হযরতের নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে এতে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর বিষয় রয়েছে, সবি নিশ্চয়ই আমার শাইখের রূহানী ফয়েযের বরকত। আর থেকে যাওয়া ভুলগুলো সম্পর্কে কল্যাণকামীতার হৃদয় নিয়ে আমাদের অবগত করলে কৃতজ্ঞ হব।

কিতাব সংকলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার কিছু শাগরিদ আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। দু'আ করি, এ কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ছড়িয়ে দিন হেদায়াতের আলো। দূর করে দিন গোমরাহীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার। আখেরাতে এ কিতাবকে বানান নাজাতের উসিলা। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত

মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সূচীপত্র	
আকাইদ	পৃষ্টা-৮৮
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির কিনা?	৮
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী ?	১৬
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আলিমুল গায়েব ছিলেন?	২১
তাবীজ-কবজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা	২৯
জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম	৩২
বুযুর্গদের কাশফ, কারামত, ইলহাম সম্বন্ধে আকীদা	৩৫
কুরআন ও হাদীসে কালিমায়ে তায়্যিবাহ	৩৮
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর নবী?	৪১
খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আকীদা	৪৮
ইসলাম ও গণতন্ত্র	৫৩
বাংলাদেশে প্রচলিত ভণ্ডপীরদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও তার খণ্ডন	৬১
যুগশ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ উলামায়ে কেরাম মাযহাবের অনুসারী	৭১
কুরআন হাদীসের শুধু তরজমা পড়ে আমল করা গোমরাহী?	৭৭
ইবাদাত	৯০-১২৮
দু'আ ও মুনাজাত : কিছু শর্ত ও আদব	৯০
মীলাদ-কিয়াম, সহীহ মীলাদ, ঈদে মীলাদুন্নবী ও জশনে জুলুস প্রসঙ্গ	৯৫
পবিত্র জুমু'আর দিনের বিস্তারিত নির্দেশনা ও ফযীলত	১০৪
মুসাফাহা এক হাতে করবো, নাকি দুই হাতে?	১১১
নামাযের বাইরে কোন্ সূরার শেষে কী পড়া সুন্নাত?	১২০
মহিলাদের মসজিদে গমন নাজায়েয	১২১
মু'আমালাত	১৩০-১৩৪
বেচা-কেনা ও লেন-দেন সংক্রান্ত কিছু হাদীস	১৩০
মু'আশারাত	১৩৬-১৪৪

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

সাধারণ মুসলমানের হকসমূহ	১৩৬
মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার	১৩৯
আখলাক	**১৪৬-১৫৪**
মুসলমানরা কাফেরদের অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হয়	১৪৬
আপনার সন্তানের প্রতি লক্ষ রাখুন	১৫০
দা'ওয়াত	**১৫৬-১৬০**
ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মদদপুষ্ট এনজিওর দ্বারা ইসলাম ও বাংলাদেশের ক্ষতি	১৫৬
জনগণকে দ্বীনদার বানানোর মাদরাসা ভিত্তিক কর্মসূচী	১৫৯

আকাইদ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির কিনা?

মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই চলে আসছে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। বাতিলের অবসান ঘটিয়ে হক প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেছেন অসংখ্য নবী-রাসূল, উলামা-মাশায়েখ ও সংগ্রামী মহাপুরুষ। করেছেন আমরণ সংগ্রাম।

বর্তমানেও বাতিলের সয়লাবে আচ্ছাদিত হয়ে আছে আমাদের দেশ ও সমাজ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বিশ্বমানবতার মুক্তির কাণ্ডারী, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান থেকে নিসৃত হয়েছে অমীয় বাণী, 'আমার উম্মত এমন এক যামানার সম্মুখীন হবে যখন ঈমান নিয়ে টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার ন্যায় কষ্টকর হবে'।[১]

সেই চিরন্তন বাণীর জ্বলন্ত বাস্তবায়ন আজ মুসলিম উম্মাহ ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছে। জাতীয়-বিজাতীয়, দেশীয়-বিদেশীয়, চতুর্মুখী হায়েনার আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম উম্মাহর স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করার স্থানটুকুও নেই। নেই ঈমান-আকীদা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো সুন্দর ও নিরাপদ কোন পরিবেশ। চারিদিকে চলছে ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা ও বাড়াবাড়ি। যার ফলে আজ দ্বীনের নামে বদ-দ্বীন এবং শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে ছেয়ে গেছে সমাজ।

এমনি এক বহুল প্রচলিত বিদ'আত ও কুসংস্কার হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করা। এর ভ্রান্তি সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

হাযির ও নাযির (حاضر وناظر) শব্দ দু'টি আরবী শব্দ। হাযির অর্থ সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে উপস্থিত বা বিদ্যমান। আর নাযির অর্থ সর্বদ্রষ্টা। যখন এ দু'টি শব্দকে একত্রে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন এর দ্বারা ঐ সত্তাকে বোঝানো হয়, যার অস্তিত্ব বিশেষ কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর অস্তিত্ব একই সময়ে গোটা দুনিয়াকে বেষ্টন করে রাখে এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের অবস্থা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সামনে থাকে।

---

১. জামে' তিরমিযী; হাদীস ২২৬০, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৯০৭৩

হাযির-নাযির সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকলেই একমত যে, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে হাযির-নাযির কথাটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। হাযির-নাযির হওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সিফাত। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ এসব গুণের অধিকারী হতে পারে না। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোন পীর-বুযুর্গ, ওলী-দরবেশও হাযির-নাযির হতে পারেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোন পীর-বুযুর্গ, ওলী-দরবেশকে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করা কুফর ও শিরকের শামিল এবং ইসলামী আকীদার পরিপন্থী।

হাযির-নাযির সম্পর্কে বিদ'আতীদের আকীদা

বিদ'আতীদের আকীদা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির বা সর্বত্র বিরাজমান। এই বিশ্বাসের কারণে তারা মীলাদের মধ্যে 'কিয়াম' করে থাকে। তারা মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি তা জানেন এবং দেখেন। কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাই তাঁর উপস্থিতিতে 'কিয়াম' করতে হবে। তাদের আকীদা মতে শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নন; বরং সকল বুযুর্গানে দ্বীনও হাযির-নাযির, সর্বত্র বিদ্যমান। তারাও পৃথিবীর সব কিছুকে হাতের তালুর মতো দেখতে পান। তারা দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনতে পান। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারেন এবং হাজার হাজার মাইল দূরের হাজতমন্দ ব্যক্তির হাজত পূরণ করতে পারেন। নাঊযুবিল্লাহ!

খণ্ডন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির এ দাবি দ্বারা তারা যদি তাঁর সর্বত্র শারীরিকভাবে বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে তা অযৌক্তিক এবং সুস্পষ্ট গোমরাহী হবে। কারণ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওযা মুবারকে আরাম করছেন। সমস্ত আশেকীনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়ে হাযিরা দেন। তাঁর রওযা মুবারক যিয়ারত করেন।

আর যদি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র 'হাযির-নাযির' এ দাবি দ্বারা তাঁর 'রূহানী হাযিরী' উদ্দেশ্য নেয় অর্থাৎ এটা বোঝায় যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

পবিত্র রূহের জন্য সর্বস্থানে বিচরণ করার অনুমতি রয়েছে, তাহলে বলবো, যদি মেনেও নেয়া হয় যে, তার জন্য রূহানীভাবে সর্বস্থানে হাযির হওয়ার অনুমতি রয়েছে তবু এ অনুমতির দ্বারাই তাঁর সর্বস্থানে উপস্থিত হওয়া প্রমাণিত হয় না। সর্বস্থানে বিচরণের অনুমতি থাকা আর বাস্তবেই সর্বস্থানে উপস্থিত হওয়া এক কথা নয়।

তবে আসল কথা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বত্র রূহানী উপস্থিতির বিষয়টি মেনে নেয়ার অর্থ হলো, তিনি গায়েব জানেন। অথচ কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, তিনি জীবদ্দশাতেও গায়েব জানতেন না। আর মৃত্যুর পরও তিনি ততটুকুই জানেন যতটুকু তাঁকে জানানো হয়। সুতরাং রূহানীভাবে হাযির-নাযির হওয়ার বিশ্বাসটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এখন যদি কেউ কোন নির্দিষ্ট স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী উপস্থিতির দাবি করে, তাহলে সেটা হবে একটা স্বতন্ত্র দাবি। এর স্বপক্ষে দলীল থাকা জরুরী। অথচ এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। সুতরাং দলীলহীন এমন আকীদা পোষণ করা নাজায়েয হবে। এ বিষয়ে বিদ'আতীরা তাদের দাবির পক্ষে যেসব দলীল পেশ করে থাকে সেগুলো দ্বারা কোনভাবেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'হাযির-নাযির' হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

বিদ'আতীদের দলীল ও তার খণ্ডন

১ম দলীল: বিদ'আতীরা তাদের দাবির পক্ষে সবচেয়ে জোরালোভাবে যে দলীল পেশ করে থাকে তা হলো, সূরা আহযাবের দু'টি আয়াত যেখানে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, 'হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি শাহিদ (সাক্ষ্যদাতা), সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে'।[২]

---

২. সূরা আহযাব; আয়াত ৪৫-৪৬

এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘শাহিদ’ (شاهد) বলা হয়েছে। ‘শাহিদ’ শব্দের অর্থ ‘সাক্ষ্যদাতা’ও হতে পারে আবার ‘হাযির-নাযির’ ও হতে পারে। সাক্ষ্যদাতাকে ‘শাহিদ’ এজন্য বলা হয় যে, সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাক্ষ্য দেয়। বিদ‘আতীদের দাবি অনুযায়ী এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘শাহিদ’ এ কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি অদৃশ্যের বিষয় দেখে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। অন্যথায় অন্যান্য নবীও তো সাক্ষ্য প্রদান করে থাকেন। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীর মাঝে পার্থক্য থাকলো কোথায়?

অথবা এ কারণে ‘শাহিদ’ বলা হয়েছে যে, তিনি কিয়ামতের দিন সকল নবীর পক্ষে চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর দেখা ছাড়া এমন সাক্ষ্য দেয়া সম্ভব নয়। আর এটাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাযির-নাযির হওয়ার প্রমাণ।

অনুরূপভাবে বিদ‘আতীদের দাবি অনুযায়ী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবাশ্‌শির (সুসংবাদদাতা), নাযীর (সতর্ককারী) এবং দাঈ ইলাল্লাহ (মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) হওয়াও তাঁর হাযির-নাযির হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা এসব কাজ অন্যান্য নবীও করেছেন। তবে তাঁরা করেছেন শুনে শুনে আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন দেখে দেখে।

অনুরূপ এ আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘সিরাজ’ ও ‘মুনীর’ (তথা আলো বিস্তারকারী প্রদীপ) বলা হয়েছে। যার অর্থ সূর্য। এটা পৃথিবীর সর্বস্থানে বিদ্যমান, প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যমান। তদ্রূপ নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বস্থানে বিদ্যমান। সুতরাং এই আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দ থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘হাযির-নাযির’ হওয়া প্রমাণিত হয়।

জবাব: বিদ‘আতী ভাইয়েরা এ সত্যটুকুও অনুধাবন করতে পারেননি যে, সূর্য সর্বস্থানে বিদ্যমান নয়; বরং যেখানে দিন সূর্য শুধু সেখানেই বিদ্যমান থাকে। আর যেখানে রাত সেখানে সূর্য অবিদ্যমান। সুতরাং এই উপমার মাধ্যমে বিদ‘আতীদের দাবি প্রমাণিত হয় না; বরং এর বিপরীতে তাদের বক্তব্য দ্বারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বত্র হাযির-নাযির না হওয়া প্রমাণিত হয়। আর নবীগণ গায়েব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন, এর দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সবকিছু জানা ও দেখা প্রমাণিত হয় না। বরং আল্লাহ

তা'আলা প্রদত্ত ওহী ও ইলমের মাধ্যমে যতটুকু জানেন তাঁরা শুধু ততটুকুরই সংবাদ প্রদান করে থাকেন।

অনুরূপভাবে বিদ'আতীরা 'শাহিদ' শব্দের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও প্রবৃত্তি নির্ভর বৈ কিছুই না। কারণ 'শাহিদ' শব্দটি ইসমে ফায়েলের সীগা। যার অর্থ নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ প্রচার করা। এর জন্য সাক্ষ্যদাতাকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সাক্ষ্য দেয়া জরুরী নয়। কারণ অন্যের মাধ্যমে কোন কিছু নিশ্চিতভাবে জেনে সাক্ষী দিলেও তার সংবাদদাতাকে শাহিদ বলা হবে।

২য় দলীল: বিদ'আতীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে সেসব হাদীস পেশ করে, যেসব হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণী ইরশাদ করেছেন। যেমন এক হাদীসে আছে, 'আমি তোমাদের ঘরে বৃষ্টির ন্যায় ফেতনা পড়তে দেখছি'। এছাড়াও জান্নাত-জাহান্নাম, হাউযে কাউসার, বরযখ ইত্যাদির খবর প্রদান সম্বলিত হাদীস দ্বারাও তাঁর হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করে থাকে।

জবাব: এ ব্যাপারে শেখ সা'দী রহ. সুন্দর বলেছেন, 'কেউ হযরত ইয়াকূব আ. কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ব্যাপার কি? আপনি মিসর থেকে শত সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করেও হযরত ইউসূফ আ. এর জামার ঘ্রাণ পেলেন। অথচ কেনানের অনতিদূরের এক কূপে তার ভাইয়েরা যখন তাকে নিক্ষেপ করলো আপনি তা দেখতে পেলেন না? উত্তরে তিনি বললেন, আমাদের অবস্থা হলো আকাশে চমকানো বিদ্যুতের ন্যায়। যা চমকে উঠেই হারিয়ে যায় (অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীর ফয়যান হয়, তখন আমরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দেখতে পাই। তবে এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না, অল্পক্ষণ পরেই শেষ হয়ে যায়।) কখনো আমরা উঁচু আসনে বসি, আবার কখনো নিজের পায়ের পিঠ পর্যন্ত দেখতে পাই না'।[৩]

এ কথাগুলো তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেননি বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন এবং উম্মতকে জানানোর জন্য আদেশ করেছেন।

---

৩. গুলিস্তাঁ ২/৭৩

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, নবীগণ হাযির-নাযির নন; বরং তাদেরকে যতটুক জানানো হয়, তাঁরা শুধু ততটুকুই জেনে থাকেন।

এছাড়াও বিদ'আতীরা আরো অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করে থাকেন, যেখানে তারা কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও প্রবৃত্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটির দ্বারাই তাঁর 'হাযির-নাযির' হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দলীল

প্রথম দলীল: আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন, 'আপনি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মূসার কাছে হুকুম প্রেরণ করেছি। আপনি তা প্রত্যক্ষও করেননি'।[৪]

পাঠক! একটু চিন্তা করুন, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের আয়াত নাযিল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা শুনিয়ে বলছেন, আপনি তূর পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে হাযিরও ছিলেন না নাযিরও ছিলেন না অর্থাৎ ঘটনাস্থলে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন না এবং ঘটনা প্রত্যক্ষও করেননি। তাই কুরআনের আয়াত নাযিল করে আমি আপনাকে সেই ঘটনা শোনাচ্ছি। কিন্তু আমার বিদ'আতী ভাইয়েরা আজ বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তা প্রত্যক্ষ করেছেন। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে কি পরিমাণ অজ্ঞ হলে মানুষ এমন কথা বলতে পারে?

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় আপনি (তূর পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে) হাযিরও ছিলেন না নাযিরও ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে হাযির-নাযির বলা হলে আল্লাহ তা'আলার কথা নিরর্থক প্রমাণিত হয়। নাঊযুবিল্লাহ।

---

৪. সূরা কাসাস; আয়াত ৪৪

দ্বিতীয় দলীল: অপর স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আপনার আশপাশের পল্লীবাসী ও মদীনাবাসীর মাঝে এমন কিছু মুনাফিক রয়েছে যারা মুনাফিকীতে সিদ্ধ। আপনি তাদের সম্পর্কে জানেন না, আমি জানি'।[৫]

তৃতীয় দলীল: আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ভাইদের ঘটনা বিস্তারিত জানানোর পর ইরশাদ করেন, '(হে নবী!) এ কাহিনী অদৃশ্য সংবাদসমূহের একটি, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি, আর আপনি সেই সময় তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না যখন তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিলো (যে তারা ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিবে)'।[৬]

এখানে আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে নবী হযরত ইউসুফ আ. এর দশ ভাই মিলে যখন হযরত ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করছিলো তখন আপনি সেখানে হাযির ছিলেন না এবং এ ঘটনার নাযিরও ছিলেন না, তাই ওহী নাযিল করে আপনাকে আমি তাঁর কাহিনী অবগত করছি।

চতুর্থ দলীল: হযরত মারয়াম এবং হযরত যাকারিয়া আ. এর ঘটনা নবীজীকে অবগত করার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, '(হে নবী!) এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে দিচ্ছি। তখন আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন মারয়ামের তত্ত্বাবধান কে করবে- (এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য) তারা নিজ-নিজ কলম নিক্ষেপ করছিলেন এবং তখনও আপনি তাদের কাছে (হাযির) ছিলেন না, যখন তারা (এ বিষয়ে) একে অন্যের সাথে বাদানুবাদ করছিলো। (তখন আপনি ঘটনার নাযিরও ছিলেন না)'[৭]

পঞ্চম দলীল: অনুরূপভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর হাযির-নাযির হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের পক্ষ হতে পৃথিবীতে বিচরণকারী কিছু

---

৫. সূরা তাওবা; আয়াত ১০১
৬. সূরা ইউসুফ; আয়াত ১০২
৭. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৪৪

ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে, যারা (পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে) আমার উম্মতের প্রেরিত সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়।[৮]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হাযির-নাযিরই হন, তাহলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সালাম পৌঁছানোর প্রয়োজনটা কী? এ ধরণের অসংখ্য প্রমাণ হাদীসের কিতাবের পাতায় পাতায় বিদ্যমান যার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি হাযির-নাযির নন।

কুরআনের এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাযির-নাযির' নন বরং আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে যতটুকু অবগত করেন, তিনি ততটুকুই জানেন, এর বেশি কিছুই তিনি জানেন না। তাকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করা শিরকী আকীদা, যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তি তাওবা করে নতুনভাবে ঈমান না আনলে সে কখনো বেহেশতে যেতে পারবে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের কোন বিধান পালনে শিথিলতার যেমন কোন অবকাশ নেই, তেমনি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়িরও কোন সুযোগ নেই। প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সঠিক এবং সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। অন্যান্য বিষয়ের মতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও রয়েছে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা। সেসব বর্ণনা অনুযায়ী সঠিক আকীদা পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

৮. সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১২৮২, মুস্তাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৫৭৬

আল্লাহ তা‘আলা বহু সংখ্যক মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে তিন শ্রেণীর মাখলূক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হলো মাটির মানুষ, যার সম্মান বোঝানোর জন্য ফেরেশতা, জিন ও ঐ সময়ের সকল মাখলূকের প্রতি আদেশ হয়েছিলো হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে। দ্বিতীয় মাখলূক নূরের তৈরি ফেরেশতা। তৃতীয় আগুনের তৈরি জিন জাতি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের তৈরি, সে বিষয়েও কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা-বিশ্বাস হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম শ্রেণীর মাখলূক, তথা– মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের বা আগুনের তৈরি ছিলেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য মানুষের মতই মানুষ ছিলেন। আর লক্ষাধিক নবী-রাসূলসহ সকল মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন। তবে মানবিকতা এবং নীতি- নৈতিকতায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর উন্নত চরিত্র ও উত্তম আদর্শের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيم

অর্থ: নিশ্চয় আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।[৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

অর্থ: অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ; যারা আল্লাহ তা‘আলা ও শেষ দিবসের ব্যাপারে ভয় রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।[১০]

যারা বলে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি ছিলেন, তারা কুরআনে কারীমের এই আয়াত দিয়ে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করে,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

---

৯. সূরা কলম; আয়াত ৪
১০. সূরা আহযাব; আয়াত ২১

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।[১১]

তাদের দাবি হলো, উল্লিখিত আয়াতে 'নূর' শব্দ দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নূরের তৈরি না হতেন, তাহলে 'নূর' শব্দ দিয়ে তাঁকে কেন ব্যক্ত করা হলো?

তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ এ আয়াতে 'নূর' ও 'কিতাব' দ্বারা একই বিষয় বোঝানো হয়েছে।[১২] এখানে নূরের ব্যাখ্যা হিসাবে 'কিতাব' শব্দটি আনা হয়েছে। তার প্রমাণ হলো পরবর্তী আয়াত,

يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

এখানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি 'নূর' দ্বারা 'নবী' উদ্দেশ্য হতো, তাহলে দ্বিবচন ব্যবহার করা হতো এবং বলা হতো يهدي بهما অর্থাৎ এ উভয়ের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে হেদায়াত দান করেন।

এরপরও যদি কোন মুফাসসির 'নূর' দ্বারা 'নবী'কে উদ্দেশ্য করেন, সে ক্ষেত্রে আয়াতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বলার কারণ এই নয় যে, তিনি নূরের তৈরি ছিলেন। বরং তাঁকে এই অর্থে 'নূর' বলা হয়েছে যে, তিনি হেদায়াত ও মা'রিফাতের নূরে নূরান্বিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা মানব ও জিন জাতিকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন এবং তাদেরকে শিরক ও কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের নূর দান করেছেন।[১৩]

কুরআন-সুন্নাহর যে সকল জায়গায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূর বলা হয়েছে, সবখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। সেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাঁকে নূরের তৈরি বিশ্বাস করলে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর মাখলূক থেকে নামিয়ে দ্বিতীয়

---

১১. সূরা মায়িদা; আয়াত ১৫

১২. তাফসীরে বাইযাবী ২/১২০, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৬৮, তাফসীরে যামাখশারী ১/৬১৭, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৬২, সাফওয়াতুত্ তাফাসীর ১/৩০৮, আত্তাফসীরুল কুরআনী লিল-কুরআন ৩/১০৬০, তাফসীরে রূহুল বয়ান ২/৩৬৯; সূরা মায়িদা।

১৩. তাফসীরে ত্বাবারী ১০/১৪৩, তাফসীরুল খাযিন ২/২৪, তাফসীরে রাযী ১১/৩২৭, তাফসীরে রূহুল বায়ান ২/৩৬৯; সূরা মায়িদা।

শ্রেণীর মাখলূক সাব্যস্ত করা হয়, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে স্পষ্ট বেয়াদবী। এর ফলে তাঁর সম্মান খাটো করা হয়। মাটির তৈরি বলা হলে তাঁকে অসম্মান করা হয়– এ কথা সহীহ নয়; বরং এটা ইবলিস শয়তানের বিশ্বাস। এ কারণেই সে মাটির তৈরি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে রাজি হয়নি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন, তা কুরআনে কারীমে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তা উম্মতকে বলে গেছেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অর্থ: (হে নবী!) আপনি বলুন, *আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।* (তবে পার্থক্য হলো,) আমার প্রতি এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবলই একজন।[১৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

অর্থ: (হে নবী!) আপনি বলুন, আমার রব (আল্লাহ) পবিত্র। *আমি কেবলই একজন মানব রাসূল।*[১৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

অর্থ: আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?[১৬]

সহীহ বুখারীতে হযরত আলকামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে ভুল হয়ে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে কি নতুন কোন বিষয় ঘটেছে? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কী হয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম

১৪. সূরা কাহ্ফ; আয়াত ১১০, সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ; আয়াত ৬
১৫. সূরা বানী ইসরাঈল; আয়াত ৯৩
১৬. সূরা আম্বিয়া; আয়াত ৩৪

বললেন, আপনি এভাবে এভাবে (অন্যান্য সময়ের তুলনায় ভিন্নভাবে) নামায পড়লেন! তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা মুড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং দু'টি সিজদা (সিজদায়ে সাহু) দিলেন। তারপর সালাম ফেরালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন,

إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.

'যদি নামাযে কোন নতুন বিষয় ঘটতো, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করতাম। কিন্তু *আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ।* তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই। সুতরাং আমি যদি (কোন কিছু) ভুলে যাই, তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।'[১৭]

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر، يغضب كما يغضب البشر ...

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ! *মুহাম্মাদ তো শুধু একজন মানুষ।* সে ক্রুদ্ধ হয়, যেমন অন্যান্য মানুষ ক্রুদ্ধ হয়...'।[১৮]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসসমূহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বাশার' বলা হয়েছে। আর 'বাশার' শব্দের অর্থ হলো, রক্ত-গোশতে তৈরি সাধারণ মানুষ। তথাপি কুরআন-হাদীসে আছে, তিনি আমাদের মতই মানুষ। তবে তাঁর কাছে ওহী আসে, আর আমাদের কাছে ওহী আসে না। আর এটা সকলেরই জানা আছে যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আয়াত এবং সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। নূরের তৈরি ছিলেন না। আয়াত এবং হাদীসের যেখানেই তাঁকে 'নূর' বলা হয়েছে, সেখানে তাঁকে রূপক অর্থে 'নূর' বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা।

---

১৭. সহীহ বুখারী; হাদীস ৪০১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৭২
১৮. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬০১

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক আকীদা পোষণ করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আলিমুল গায়েব তথা পূর্বাপর এবং বর্তমানের সকল বিষয়ে অবগত ছিলেন?

আলিমুল গায়েব বলা হয়, যিনি অদৃশ্যের সকল খবর এবং অদৃশের সকল বিষয় কেউ জানানো ব্যতীত নিজস্বভাবে জানেন। আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। কোনো নবী-রাসূল আলিমুল গায়েব ছিলেন না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েব জানা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ইহকালীন ও পরকালীন দৃশ্য-অদৃশ্যের সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করেছেন। বিশেষ করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শান অনুযায়ী অতীত ও ভবিষ্যতের অসংখ্য ঘটনা, আলমে বরযখ, কবরের অবস্থা, ময়দানে মাহশারের চিত্র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়েছেন যা অন্য কোনো নবী এবং নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাকেও জানানো হয়নি। এগুলো থেকে অনেক বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকেও জানিয়েছিলেন। এটাকে গায়েব জানা বলা হয় না। কারণ এগুলো ছাড়াও অদৃশ্যের অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো তিনি জানতেন না।

সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃশ্য-অদৃশ্যের সকল বিষয় জানতেন এবং পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে যা কিছু ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সবকিছুই তিনি জানেন, অথবা তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কখন কোথায় কী হচ্ছে, সবকিছুই তিনি জানেন বা দেখছেন, এমন আকীদা পোষণ করা স্পষ্ট কুফরী ও শিরকী কাজ।

মনে রাখতে হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাধারণ থেকে সাধারণ বেআদবী যেমন কুফরীর কারণ, ঠিক তেমনি তাকে খোদায়ী গুণ, (তথা আলিমুল গায়েবের গুণে) গুণান্বিত করে খোদার আসনে বসানোও সুস্পষ্ট শিরক এবং আল্লাহ তা'আলার শানে চরম বেয়াদবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা পোষণ করার তাউফীক দান করুন। আমীন!

কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অগণিত হাদীস দ্বারা উল্লিখিত আকীদা প্রমাণিত। সেগুলো থেকে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস এখানে পেশ করা হলো।

প্রথম আয়াত :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থ: (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আসমান-যমীনে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। তারা জানে না কখন তারা উত্থিত হবে।[১৯]

দ্বিতীয় আয়াত:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

অর্থ: (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে। আমি গায়েব জানি না এবং আমি তোমাদের এটাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।[২০]

তৃতীয় আয়াত:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ: কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। তিনি বারি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন মাতৃগর্ভে কী রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী

---

১৯. সূরা নামল; আয়াত ৬৫
২০. সুরা আন'আম; আয়াত ৫০

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবগত।[২১]

চতুর্থ আয়াত:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থ: অদৃশ্যের চাবিকাঠি কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে, তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না।[২২]

পঞ্চম আয়াত:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অর্থ: (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না।[২৩]

উল্লিখিত সবগুলো আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কেউ (তিনি নবী হোন কিংবা ফেরেশতা) অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না।

প্রথম হাদীস:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন, সে মিথ্যাবাদী। কারণ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বলতেন, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন না।[২৪]

দ্বিতীয় হাদীস:

---

২১. সুরা আন‘আম; আয়াত ৩৪
২২. সুরা আন‘আম; আয়াত ৫৯
২৩. সুরা আ‘রাফ; আয়াত ১৮৮
২৪. বুখারী; হাদীস ৭৩৮০

عن اياس بن سلمة عن ابيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ عَقُوقٍ يَتْبَعُهَا مُهْرُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ قَالَ: فَمَتَى تُمْطَرُ؟ قَالَ: غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ قَالَ: فَمَا فِي بَطْنِ فَرَسِي؟ قَالَ: غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ

উপরোক্ত হাদীসের সারাংশ হলো, এক অশ্বারোহী নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গায়েবের বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করলো,

১. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

২. আমাদের উপর বৃষ্টি কখন বর্ষণ হবে?

৩. আমার ঘোড়ার পেটের বাচ্চাটি কী (নর না মাদী)?

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলোর উত্তরেই বলেছেন, এটা গায়েবের বিষয় আর গায়েব আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না।[২৫]

এখন প্রশ্ন হলো, যদি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেনই তাহলে তিনি উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে একথা কেন বললেন যে, এটা গায়েবের বিষয়, আর গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না?

তৃতীয় হাদীস:

عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهِمْ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার কয়েকজন বিবির নিকট গেলেন, তখন তাদের ঘরে যে খেজুর ছিলো তার চেয়ে উত্তম খেজুর দেখে বললেন, তোমরা এ খেজুর কোত্থেকে পেলে? তারা বললেন, আমরা আমাদের দুই সা' (নিম্নমানের খেজুর) এর বিনিময়ে এক সা' (উত্তম খেজুর) গ্রহণ করেছি।[২৬]

২৫. আল মু'জামুল কাবীর; হাদীস ৬৬৪৫
২৬. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হদীস: ১৬১৯১

এবার বলুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেনই তাহলে বিবিদেরকে কেন প্রশ্ন করলেন যে, তোমরা এ খেজুর কোত্থেকে পেলে?

চতুর্থ হাদীস:

অর্থ: আমের ইবনে মালেক নামে এক ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নজদবাসীর নিকট কিছু সাহাবী প্রেরণ করা হয় আর তারা নজদবাসীকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়, তাহলে আমি আশা করি তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়। তখন সে বললো, আমি তাদের দায়িত্ব নিব। সুতরাং তার দায়িত্ব গ্রহণের শর্তে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন সাহাবীর এক জামা'আত যারা ক্বারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাদেরকে নজদে প্রেরণ করলেন। যখন তাঁরা বীরে মা'উনা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন নজদবাসী এই সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করে ফেললো।[২৭]

সম্মানিত পাঠক! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন যে, তাঁর সত্তরজন জালীলুর কদর সাহাবীকে শহীদ করে ফেলা হবে, তাহলে কি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রেরণ করতেন?

পঞ্চম হাদীস:

খাইবার যুদ্ধের পর যাইনাব বিনতে হারিস নামক এক ইয়াহুদী মহিলা কৌশলে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত হাদিয়া পেশ করলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত মুখে দেয়া মাত্রই 'গোশতের টুকরাটিই' বিষ মিশ্রিত হওয়ার বিষয়টি নবীজীকে জানিয়ে দিল। সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত রেখে দিলেন। ইতোমধ্যে নবীজীর সঙ্গী সাহাবী হযরত বিশর ইবনে বারা রাযি. তা গলধঃকরণ করে ফেলেন। এর বিষক্রিয়ায় তিনি ইন্তিকাল করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এর বিষক্রিয়ায় কিছুটা

---

২৭. সহীহ বুখারী; হাদীস ৩০৬৪

আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসা স্বরূপ তিনি শিংগা লাগান। ফেলেন পরবর্তীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকালেও সে বিষক্রিয়া অনুভব করেছিলেন।[২৮]

এখন পাঠকের কাছে প্রশ্ন হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তাহলে কি তিনি বিষমিশ্রিত গোশত নিজে মুখে দিতেন এবং নিজ সাহাবীকে খেতে দিতেন?

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়েব ছিলেন না।

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েব জানা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদা

বিদ‘আতী ও রেযাখানীদের আকীদা হলো, পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সবকিছুই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন। তাঁর মৃত্যুপূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে যখন যেখানে যা কিছু ঘটছে, সবকিছুই তিনি জানেন। তারা এর স্বপক্ষে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস পেশ করেন। নিম্নে সেগুলো জবাবসহ উল্লেখ করা হলো।

প্রথম আয়াত:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলার শান এটা নয় যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েবের বিষয়ে অবগত করবেন, তবে তিনি স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।[২৯]

বিদ‘আতীদের বক্তব্য হলো, এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে গায়েবের বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াত:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

---

২৮. সহীহ বুখারী; হাদীস ৪২৪৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহয়া: ৪/১২৭-১২৮
২৯. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৭৯

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত গায়েবের বিষয়ে কাউকে অবহিত করেন না।[৩০]

তারা বলে, এই আয়াত স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

খণ্ডন: এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু বিষয়ে গায়েবের জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্যের সকল জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

এ আয়াতে مَا تُوعَدُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আযাব অথবা কিয়ামত। তাহলে আয়াতের অর্থ হয়, হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি জানি না তোমাদেরকে যে (আযাব বা কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা সন্নিকটেই নাকি আমার প্রভু তার জন্য (ভিন্ন) কোন সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন।[৩১]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাব অথবা কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জানেন না। তাহলে এ কথা বলা কিভাবে সহীহ হয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের সকল বিষয়ে অবগত?

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়েব ছিলেন না। সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়েব না হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন তাতে সামান্যতম ঘাটতি আসবে না, বরং যথার্থই বাকী থাকবে। কারণ নবী বা রাসূল হওয়ার জন্য গায়েবের ইলম থাকা শর্ত নয়, তার নিকট ওহী আসা শর্ত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা পোষণ করার তাউফীক দান করুন। আমীন!

---

৩০. সূরা জিন্ন; আয়াত ২৬-২৭
৩১. সূরা জিন্ন; আয়াত ২৫

তাবীজ-কবজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা

বর্তমান যুগে ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজের ব্যাপারে মানুষের মাঝে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ তো ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজকে একেবারে অস্বীকার করে এবং এ সকল কাজকে নাজায়েয, হারাম এমনকি শিরকও মনে করে। অপরদিকে কেউ কেউ তাবীজ-কবজে এতটাই বিশ্বাসী যে, তাবীজ-কবজকে স্বয়ংক্রিয় ও নিজস্ব কার্যক্ষমতার অধিকারী মনে করে। প্রতিটি কাজেই তারা তাবীজের অনুসন্ধান করে। উল্লিখিত পন্থা দু'টির কোনটিই সঠিক নয়। বরং তাবীজ-কবজকে উসীলা মনে করে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে আমল করাই হলো একমাত্র সহীহ তরীকা।[৩২]

শরী'আতের দৃষ্টিতে রোগ হলে যেমন ঔষধ ব্যবহার করা বৈধ, তেমনি রোগ-বালাই ও বিভিন্ন সমস্যায় দু'আ-দুরূদের ব্যবহারও শরী'আতসম্মত। কুরআনের আয়াত, হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আ ও আল্লাহর নাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।[৩৩] তদ্রূপ কুফর ও শিরকমুক্ত কোন নকশা বা শব্দ দ্বারা তৈরি তাবীজ ব্যবহার করাও জায়েয। পক্ষান্তরে কুফর ও শিরক মিশ্রিত নকশা বা শব্দ অথবা অর্থ বুঝে আসে না এমন শব্দ দ্বারা তৈরি তাবীজ ব্যবহার করা নাজায়েয।[৩৪] আর তাবীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলোর নিজস্ব কোন কার্যক্ষমতা নেই।[৩৫] এগুলো উসীলা মাত্র। বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ঝাড়-ফুঁক করতেন। যে সকল হাদীসে তাবীজ-কবজকে শিরক বলা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল তাবীজ যাতে শিরকী ও কুফরী কথা রয়েছে। যেমনটি ছিলো জাহিলী যুগের তাবীজ-কবজে।[৩৬] অথবা যে ক্ষেত্রে উসীলা মনে না করে তাবীজ-কবজকেই নিজস্ব কার্যক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করা হয়।

---

৩২. মুজার্‌রাবাতে আকাবির, জাস্টিস মুফতী তকী উসমানী দা.বা.; পৃষ্ঠা ৪৫
৩৩. মিরক্বাতুল মাফাতীহ; পৃষ্ঠা ৮/৩৬
৩৪. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: পৃষ্ঠা ৪/৩২৫; হাদীস ৫৬৮৮
৩৫. বযলুল মাজহূদ: পৃষ্ঠা ১১/৬১২; হাদীস ৩৮৮৩
৩৬. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ১/১৭৯

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

এমন বিশ্বাস নিয়ে এ্যালোপ্যথিক, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করানোও শিরকের অন্তর্ভুক্ত; শুধু তাবীজ-কবজ নয়।

তাবীজ-কবজ জায়েয হওয়ার আরো কিছু দলীল

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী ও সাহাবায়ে কেরামের আমল।

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه.

অর্থ: হযরত ‘আমর ইবনে শু‘আইব স্বীয় পিতা এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, সে যেন বলে,

أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون

তাহলে সেই ভয় কিছুতেই তার কোনরূপ ক্ষতি করবে না। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাযি. এ দু‘আ স্বীয় সন্তানদের মধ্যে যে বালেগ হয়েছে তাকে মুখে বলাতেন এবং যে বালেগ হয়নি এ দু‘আ কোন পর্চায় লিখে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।[৩৭]

২. তাবেয়ীগণের মধ্যেও অনেকে তাবিজ লিখে দিতেন। যথা-

كان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم

হযরত মুজাহিদ রহ. মানুষের জন্য তাবীজ লিখতেন এবং তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।[৩৮]

তদ্রূপ ইবনে সিরীন ও জাহহাক রহ. প্রমুখ থেকেও এমন আমল বর্ণিত আছে।

---

৩৭. জামে’ তরমিযী; হাদীস ৩৫২৮

৩৮. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ২৩৫৪৫

৩. হযরত মুফতী শাইখ নিযাম রহ. তার বিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ হিন্দিয়ায় লেখেন, ولا بأس بتعليق التعويذ তথা তাবীজ ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই।[৩৯]

৪. তদ্রূপ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তার ফাতাওয়া গ্রন্থে লেখেন, বিপদগ্রস্ত ও অন্যান্য অসুস্থ লোকদের জন্য (পবিত্র) কালি দ্বারা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর যিকির থেকে কিছু লেখা এবং তা ধুয়ে পান করানো জায়েয হবে।[৪০]

আসল পদ্ধতি ঝাড়-ফুঁক

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, ঝাড়-ফুঁক তাবীজ থেকে বেশি উপকারী। এর তাসীর তাবীজের তাসীর থেকে দ্বিগুণ। কেননা এ আমল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এর তালকীন করেছেন। যেখানে ঝাড়-ফুঁক করার কোন লোক নেই, সেখানে তাবীজ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে উভয় তরীকাই সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে।[৪১]

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

জাতীয়তাবাদ কথাটি ইংরেজী Nationalism এর অনুবাদ। যা Nation (জাতি) শব্দ হতে উদ্ভূত। আরবীতে قومية অর্থ জাতীয়তা। যা قوم (জাতি) শব্দ হতে উদ্ভূত।

একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা, শান্তি ও অগ্রগতি এবং বহির্বিশ্বে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের জাতি কতটা সুসংহত, স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত এবং ঐক্যের বাঁধনে সংঘবদ্ধ তার ওপর। প্রশ্ন হলো, এই জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের ভিত্তি কী হবে? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে বিপরীতমুখী দু'টি দর্শন বিশেষভাবে লক্ষণীয়-

---

৩৯. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৫৯
৪০. মাজমূ'আয়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, মাস'আলা ১৯
৪১. মুজার্‌রাবাতে আকাবির; পৃষ্ঠা ৪৯

১. ইসলামী দর্শন।
২. গণতান্ত্রিক দর্শন।

ইসলামী দর্শন: জাতীয়তা বা জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হলো ধর্ম। এখানে বংশ, বর্ণ, ভাষা কিংবা ভৌগলিক সীমারেখার কোন ভূমিকা নেই। আর সত্য ধর্ম যেহেতু কেবলই ইসলাম, এছাড়া বাকী সব অসার এবং মিথ্যা। কাজেই এই দৃষ্টিকোণ থেকে সারা বিশ্বের সত্যধর্মের অনুসারী মুসলমান হলো এক জাতি এবং সমস্ত মিথ্যাধর্মের অনুসারী কাফেররা এক জাতি। চাই তারা হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম ভিন্ন অন্য যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ: প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলমান ভাই ভাই।[৪২]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা ভালভাবে দেখছেন।[৪৩]

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থ: আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো সত্য এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক।[৪৪]

হাদীসে এসেছে,

عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه، اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.

---

৪২. সূরা হুজুরাত; আয়াত ১০
৪৩. সূরা তাগাবুন; আয়াত ২
৪৪. সূরা কাহ্ফ; আয়াত ২৯

অর্থ: সকল মুসলমান এক ব্যক্তির ন্যায়। যদি তার চোখে ব্যথা অনুভব করে, তাহলে পুরো দেহেও তা অনুভব হয়। আর যদি মাথায় ব্যথা অনুভব করে, তাহলেও পুরো দেহে তা অনুভব হয়।[৪৫]

অপর এক হাদীসে আছে,

الكفر ملة واحدة

অর্থ: সমস্ত কাফের এক জাতি।[৪৬]

পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক দর্শন হলো, ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হবে বংশ, ভাষা বা ভৌগলিক অবস্থান। এই দর্শন মতে প্রতিটি দেশ এক একটি জাতি। সে দেশের নাগরিক, যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। বংশ, ভাষা ও ভৌগলিক সীমারেখার আলোকে জাতীয় ঐক্য গঠনের গণতান্ত্রিক এই দর্শনই জাতীয়তাবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

জাতীয়তাবাদ সংহতি নাকি বিভক্তি?

গণতন্ত্রের দর্শন মতে যদি জাতীয় ঐক্যের মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়। তবে এতে করে একই দেশের জেলা ও প্রদেশগুলো ধর্ম, বর্ণ কিংবা ভাষার বিভিন্নতার ভিত্তিতে স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠবে এবং মানব জাতি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বৈরিতা ও সংকীর্ণতার আঁধারে হারিয়ে যাবে।

বস্তুতঃ ন্যাশনালিজম (Nationalism) বা জাতীয়তাবাদ এমন একটি থিউরি যা মুসলমানদেরকে শতধা বিভক্ত করে তাদের মেরুদণ্ড চরমভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। ইসলাম এই দর্শনকে কোনভাবেই সমর্থন করে না। কেননা আদম সন্তান পরস্পরে ভাই ভাই এবং সারা পৃথিবীর মানুষ একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর এই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। কেননা হযরত আদম আ. ছিলেন ঈমানদার এবং তাওহীদ ও একত্ববাদে বিশ্বাসী একজন পয়গম্বর। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করা এবং ভিন্ন জাতি বা দল সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে কুফ্‌র। অতএব যে এই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করে দিলো সে কাফের হয়ে গেলো। কাজেই মানব জাতির মধ্যে বিভাজন শুধু ঈমান ও

৪৫. মুসলিম; হাদীস ৬৭
৪৬. মুয়াত্তা ইমাম মালেক; হাদীস ৭২৮

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

কুফরের ভিত্তিতেই হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, গোত্র বা ভৌগলিক স্থানের মধ্য থেকে কোনটাই মানবীয় ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, আভিধানিক অর্থে দেশ বা গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে জাতি শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে। কুরআনে কারীমেও জাতি শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের গোত্রীয় লোকদেরকে 'ইয়া কওমী' বলে সম্বোধন করেছেন। অথচ তার গোত্রের লোকেরা কাফের ছিলো। এতে বোঝা যায়, আভিধানিক অর্থে গোত্রীয় লোকদেরকে জাতি বলা যায়। তবে ঐক্যের ভিত্তি এর উপর রাখা যায় না।

মোটকথা, কুরআন হাদীসের ভাষায় জাতীয়তার ভিত্তি হলো ধর্ম। গোটা বিশ্বে দু'টি মাত্র জাতি, একটি মুসলিম অপরটি কাফের। শরী'আতে উত্তরাধিকারের বিধানেও সমস্ত মুসলমানকে এক জাতি আর কাফেরদেরকে ভিন্ন জাতি গণ্য করা হয়েছে। যদিও তারা এক মায়ের গর্ভজাত বা একই বাপের ঔরসজাত হোক না কেন। আজকের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সবি ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিপন্থি। দ্বীন ও ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ ধরণের মতবাদ কোন মুসলমান সমর্থন করতে পারে না।

বুযুর্গদের কাশফ, কারামত, ইলহাম এবং গাউস, কুতুব ও আবদাল সম্বন্ধে আকীদা

যেসব খাস বান্দা আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মত চলেন, নাফরমানী করেন না এবং আল্লাহ তা'আলাকে স্বীয় কর্মের অভিভাবক মনে করেন পরিভাষায় তাদেরকে বুযুর্গ বা ওলী বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বুযুর্গদের থেকে কখনো কখনো কারামত এর বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তবে তা বুযুর্গ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।[৪৭]

কাশফ, কারামত ও ইলহাম

৪৭. মাজমূআতুত তাওহীদ ২/৬৪৩, আল-মাজমূআতুস সুন্নিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৬৮

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

নবী নন– এমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম কোন অসাধারণ বিষয় সংঘটিত হওয়াকে কারামত বলা হয়।[৪৮]

আর জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় বুযুর্গানে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা যেসব ভেদের কথা জানান এবং চোখের অগোচর জিনিসকে দিলের চোখে দেখান, তাকে বলা হয় কাশফ ও ইলহাম।

এ সম্বন্ধে আকীদা

বুযুর্গদের কারামত, কাশফ ও ইলহাম সত্য। কারামত সত্য হওয়া কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হযরত মারয়ামের কাছে অমৌসুমী ফল আসা এবং আসিফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক ইয়ামান হতে বিলকীসের সিংহাসন এক মুহূর্তে সুলাইমান আ. এর দরবারে উপস্থিত করা সবই কারামতের অন্তর্ভুক্ত। কাশফ ও ইলহাম শরী'আতের মুতাবেক হলে তা গ্রহণযোগ্য অন্যথায় নয়। কাশফ ও ইলহাম শরী'আতের দলীল নয় এর দ্বারা কোন আমল প্রমাণিত হয় না।

কারামত, কাশফ, ইলহাম বুযুর্গ এবং ওলীগণের দ্বারাই হয়ে থাকে, যারা আল্লাহ তা'আলার পরম প্রিয় বান্দা। পক্ষান্তরে যারা শরী'আতের ধার ধারে না, আবার নিজেদেরকে পীর, বুযুর্গ বলে দাবি করে, সাধারন মানুষ না বুঝে এদেরকে পীর বললেও এরা হক্কানী পীর নয়; এরা হলো ভণ্ডপীর। এরা অলৌকিক কোন কিছু দেখালে সেটাকে কারামত মনে করা যাবে না বরং বুঝতে হবে সেটা যাদু, ভেল্কিবাজী কিংবা শয়তানের কারসাজী। এসব দেখে ধোঁকায় পড়ে তাদের ভক্ত হওয়া যাবে না। কারণ এতে ঈমান হারানোর সাথে সাথে আখেরাতও বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে।[৪৯]

আবদাল, গাউস, কুতুব

আবদাল, গাউস, কুতুব সম্পর্কে তাসাওউফের কিতাবাদিতে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়-

---

৪৮. আল-মাজমূআতুস সুন্নিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৬৯৮
৪৯. আল-মাজমূআতুস সুন্নিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৫৬৭০

১. কুতুব : তাকে কুতুবুল আলম, কুতুবুল আকবার, কুতুবুল ইরশাদ ও কুতুবুল আকতাবও বলা হয়। আলমে গায়েবের মধ্যে এ কুতুবকে আব্দুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তার দু'জন উযীর থাকেন যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আব্দুল মালিক। বামের উযীরের নাম আব্দুর রব। এছাড়া আরো বার জন কুতুব থাকেন, সাত জন সাত একলীমে (মহাদেশে) থাকেন তাদেরকে কুতুবে একলীম বলা হয়। আর পাঁচ জন ইয়েমেনে থাকেন তাদেরকে কুতুবে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক শহরে এবং গ্রামে একজন করে থাকেন।

২. গাউস: গাউস মাত্র একজন থাকেন। কেউ কেউ বলেছেন কুতুবকেই গাউস বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন গাউস ভিন্ন তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।

৩. আবদাল: আবদাল থাকেন চল্লিশ জন।

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন এই তিন প্রকার সহ মোট বার প্রকার ওলী-আউলিয়া মানব জগতে বিদ্যমান রয়েছে। যথা- ৪. ইমামাইন, ৫. আওতাদ, ৬. আখয়ার, ৭. আবরার, ৮. নুকাবা, ৯. নুজাবা, ১০. আমূদ, ১১. মুফাররিদ, ১২. মাকতুম।[৫০]

এ সম্বন্ধে আকীদা

প্রিয় পাঠক! ওলীদের এই প্রকার ও বিবরণ সম্পর্কে জানার মধ্যে কোন স্বার্থকতা নেই। কারণ এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, শুধু বুযুর্গানে দ্বীনের কাশফের দ্বারা এটা জানা গেছে। আর কাশফ যার হয় (শরী'আতের খেলাফ না হওয়ার শর্তে) তার জন্য সেটা দলীল, অন্যদের জন্য নয়। সুতরাং এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই শ্রেয়।

এ ধরণের কাশফি মা'লুমাত হাসিল করার পিছনে সময় নষ্ট না করে প্রত্যেকেরই নফসের ইসলাহের প্রতি গুরুত্ব দেয়া একান্ত কর্তব্য। নফসের ইসলাহ না করে দিন-রাত ধ্যানে মগ্ন থাকলে কোনো ফায়দা নেই।

---

৫০. তা'লীমুদ্দীন; পৃষ্ঠা ১৪৩

কুরআন ও হাদীসে কালিমায়ে তায়্যিবাহ

আল কুরআনে ‘কালিমায়ে তায়্যিবাহ’

‘কালিমায়ে তায়্যিবাহ’ এর প্রথম অংশটি ‘সূরা সাফফাত’ এর ৩৫ নম্বর আয়াত এবং দ্বিতীয় অংশটি ‘সূরা ফাত্হ’ এর ২৯ নম্বর আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

হাদীস শরীফে ‘কালিমায়ে তায়্যিবাহ’

1. عن عبد اللَّه بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: انطلق أبو ذر ونعيم ابن عم أبي ذر وأنا معهم يطلب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو مستتر بالجبل فقال له أبو ذر: يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول، قال: أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أبو ذر وصاحبه.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদার পিতা বুরাইদা রাযি. বলেন, আবূ যর ও তার চাচাতো ভাই নুআঈম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পাহাড়ের আড়ালে ছিলেন। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে) আবূ যর রাযি. বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনার নিকট এসেছি আপনি কী বলেন তা শুনতে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি বলি لا إله إلا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)।’ একথা শুনে আবূ যর ও তার সঙ্গী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলেন।[৫১]

2. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: حيان بن عبيد الله.

---

৫১. আল ইসাবা, ইবনে হাজার: ৬/৩৬৫। হাদীসটির সনদ সহীহ।

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা ছিলো কালো এবং পতাকা ছিলো সাদা রঙের। সে পতাকায় লেখা ছিলো لا إله إلا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)।[৫২]

3. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا، وكان مكتوبا عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله سطر، ومحمد سطر، ورسول الله سطر.

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির পাথরটি ছিলো আবিসিনীয়া এলাকার। আর তার উপর লেখা ছিলো لا إله إلا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। (উপরের) প্রথম লাইন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু', দ্বিতীয় লাইন 'মুহাম্মাদ' তৃতীয় লাইন 'রাসূলুল্লাহ'।[৫৩]

4. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، قال: من خالف دين الله من المسلمين فاقتلوه، ومن قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا من أصاب حدا، فإنه يقام عليه.

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করবে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করবে) তাকে তোমরা হত্যা করে ফেলো। আর যে لا إله إلا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বলবে তাকে কিছু বলার অধিকার কারো নেই। তবে কোন দণ্ডের উপযুক্ত হলে তা তার উপর কার্যকর করা হবে।'[৫৪]

5. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما عرج بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت في عارضي الجنة ثلاثة أسطر مكتوبات

---

৫২. আল মুজামুল আওসাত ত্ববারানী; হাদীস ২১৯। হাদীসটির সনদ সহীহ।
৫৩. আখলাকুন নবী, আবুশ শাইখ আল আসবাহানী; হাদীস ৩৩৫। হাদীসটির সনদ সহীহ।
৫৪. ত্ববাকাতুল মুহাদ্দিসীন, আবূ শাইখ আল আসবাহানী; হাদীস ২৩২। হাদীসটির সনদ সহীহ।

بالذهب: الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والثاني وجدنا ما قدمنا وربحنا ما أكلنا وخسرنا ما تركنا، والثالث أمة مذنبة ورب غفور».

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মি'রাজের রাত্রে আমি বেহেশতে প্রবেশ কালে তার দুই পাশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা তিনটি লাইন দেখতে পাই-

প্রথম লাইন: لا إله إلا الله محمد رسول الله (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল)।

দ্বিতীয় লাইন: وجدنا ما قدمنا وربحنا ما أكلنا وخسرنا ما تركنا (আমরা যা (ভালো কর্ম) পেশ করেছি তা পেয়েছি, আর যা খেয়েছি তা থেকে উপকৃত হয়েছি, যা ছেড়ে এসেছি সে ব্যাপারে তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি)।

তৃতীয় লাইন: أمة مذنبة ورب غفور (উম্মত হলো গুনাহগার আর রব হলেন ক্ষমাশীল)।[৫৫]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পর অন্য কোন ধর্মে মুক্তি আছে বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না

সৃষ্টির শুরু থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)। নাযিল করেছেন বহু আসমানী কিতাব ও সহীফা। তাঁরা যুগে যুগে তাওহীদের বাণী প্রচার করে গেছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। পূর্বের নবীর অবর্তমানে মানুষ যে বাতিল ও মিথ্যাকে সত্য মনে করে গ্রহণ করেছিলো পরবর্তী নবী এসে মানুষের সামনে সে বাতিল ও মিথ্যার অসারতা বর্ণনা

৫৫. ত্ববাকাতুশ শাফিইয়্যাহ ১/১৫০। আর ইমাম সুয়ূতী তাঁর কিতাব 'জামেউস সগীরে'র ৬৮০৮নং হাদীসে আল্লামা রাফেয়ী ও ইবনে নাজ্জারের হাওয়ালা উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি সহীহ।

করেছেন এবং সত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। একাধিক রবের ধারণা দূর করে মহান আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদের বাণী শুনিয়েছেন।

সর্বশেষ আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাইয়িদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত মানব ও জিন জাতির হেদায়াতের জন্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন। সেই সাথে তার উপর নাযিল করেছেন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে কারীম। অতএব কুরআন নাযিল হওয়ার পর যেমন অন্যান্য সকল ধর্মের কিতাব রহিত হয়ে গেছে। তেমনি শেষ নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল নবীর আনীত ধর্মও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে ইসলাম ধর্মকেই মনোনীত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : ‘আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম’।[৫৬]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে কাসীর রহ. লেখেন,

إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا صلى الله عليه وسلم بدِين على غير شريعته، فليس بمتقبل. كما قال تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] وقال في هذه الآية مخبرًا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ.

অর্থাৎ এই আয়াত দ্বারা এই সংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলাম। আর সর্বযুগেই আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত নবীদের ওহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সকল নবীর সমাপ্তকারী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার নবুয়তের পর আল্লাহ তা‘আলা পূর্বের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর কেউ যদি তার শরী‘আত ব্যতীত অন্য কোন শরী‘আত গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করে তা আল্লাহ

৫৬. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৯

তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: যে ব্যক্তি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[৫৭]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ এই আয়াতের অধীনে লেখেন, এই আয়াতে নাস্তিক্য চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। বর্তমানে উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং একথা প্রচার করা হচ্ছে যে, ভাল কাজ করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে। সে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান অথবা মূর্তিপূজারী যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। এই অতি উদারতা মূলত ইসলামী নীতিমালাকে বিকৃত করারই নামান্তর। কারণ, একথার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও পাওয়া যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের এ দু'টি আয়াত এবং এ জাতীয় অসংখ্য আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে, অন্ধকার ও আলো একত্র হওয়া যেমন অসম্ভব, অনুরূপভাবে আনুগত্য ও অবাধ্যতা একই সাথে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হওয়া একেবারেই অযৌক্তিক ও অসম্ভব বিষয়। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতিও অস্বীকার করবে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী ও রাসূলগণের শত্রু। চাই সে শাখাগত আমল ও প্রথাগত চরিত্র মাধুর্যে যতই সুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক না কেনো। পরকালের মুক্তির উপায় আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ আনুগত্য থেকে বঞ্চিত তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। পবিত্র কুরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে,

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন (আমল) ওজন করার ব্যবস্থা রাখব না'।[৫৮]

---

৫৭. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৮৫

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে তাতে দিক নির্দেশনা রয়েছে। এই আধুনিক যুগেও কুরআনের বিধান যুগোপযোগী। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মে জীবনের অনেক বিষয়েরই সমাধান নেই। আর আধুনিক বিষয়ের তো আলোচনাই নেই। এর মাধ্যমে ইসলামের সার্বজনীনতা ফুটে ওঠে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) মনোনীত করলাম।[৫৯]

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা তাদের আসমানী কিতাবের বিভিন্ন বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেকথা বলেছেন। যেমন তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থ: আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা মনে করো তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা পাঠ করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।[৬০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا
عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

---

৫৮. সূরা কাহ্ফ; আয়াত ১০৫
৫৯. সূরা মায়িদা; আয়াত ৩
৬০. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৭৮

অর্থ: তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে। যখন তাদের একদল আল্লাহর কালাম শ্রবণ করে তারপর তা জেনে বুঝে বিকৃত করে। অথচ তারা তা জানে।[৬১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

অর্থ: সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। দুর্ভোগ তাদের রচনা এবং দুর্ভোগ তাদের উপার্জনের জন্য।[৬২]

সহীহ বুখারীতে রয়েছে,

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! কি করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট জিজ্ঞাসা করো? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহ সম্পর্কিত নবতর তথ্য সম্বলিত। এটাা তোমরা তিলাওয়াত করছ এবং এর মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ নেই। তদুপরি আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যা লিখে দিয়েছেন আহলে কিতাবরা তা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তুচ্ছ মূল্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচার করেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না? আল্লাহর শপথ! তাদের একজনকেও

---

৬১. সূরা বাকারা; আয়াত ৭৫
৬২. সূরা বাকারা; আয়াত ৭৯

আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে দেখিনি।[৬৩]

সহীহ হাদীস শরীফেও অপরাপর ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যায়

এ বিষয়ে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার একটি হাদীস লক্ষ করুন,

أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه و سلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله! إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب، وقال: أمتهوكون فيها يا بن الخطاب! فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.

অর্থ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোন আহলে কিতাব (ইয়াহুদী) থেকে একটি কিতাব নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন আহলে কিতাব থেকে একটি সুন্দর কিতাব পেয়েছি। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত উমর রাযি.-এর কিতাব দেখে) রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে উমর ইবনে খাত্তাব! এটা দেখে হয়রান হয়ে পড়েছ? যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তার কসম! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দ্বীন নিয়ে এসেছি। তাদেরকে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। তাহলে (হতে পারে) তারা কোন সত্য সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবে আর তোমরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। অথবা মিথ্যা সম্পর্কে অবহিত করবে আর তোমরা তা সত্য বলে মেনে নিবে। যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! যদি হযরত মূসা আ. জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জন্যও আমার দ্বীনের অনুসরণ আবশ্যকীয় হতো।[৬৪]

এই হাদীসের আলোকে বোঝা গেল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য ধর্মের কিতাব দেখে রাগান্বিত হয়েছেন। হাদীসের শেষে একথাও তিনি বলেছেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যদি জীবত থাকতেন তাহলে তার জন্যও আমার ধর্মের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন সুযোগ থাকত না। এতে কি বোঝা যায় না যে, একজন নবী যদি নিজ ধর্ম

---

৬৩. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৬৮৫
৬৪. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ২৬৪২১

বাদ দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলা্ইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে বাধ্য থাকেন তাহলে অপরাপর ধর্মের অনুসারী; যারা নবী নন, তাদের বেলায় ইসলাম ধর্ম মেনে নেয়া ছাড়া মুক্তির আর কোন উপায় থাকতে পারে না।

সর্বশেষে একটি দাবির খণ্ডন করা জরুরী মনে করছি। তা হলো, বর্তমানে কিছু শিক্ষিত মানুষ বলে বেড়ায়, সকল ধর্মই সঠিক। আমরা সব ধর্মকে স্বস্থানে সঠিক মনে করি। যে যার ধর্ম পালন করলে মুক্তি পেয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে সূরা কাফিরূনের আয়াত لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ দিয়ে তারা এর স্বপক্ষে দলীল দিয়ে থাকে। তাদের এ দাবি একেবারেই অবান্তর। কুরআন ও হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য নেয়ার সময় সেটা যেন মনগড়া না হয়ে যায়– এদিকে সকলেরই লক্ষ রাখা উচিত। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

অর্থ: যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান না রেখে তাফসীর করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।[৬৫]

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ পানিপতী রহ. লেখেন, ‘এই আয়াতটি মূলত পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়গুলোকে দৃঢ়তর করার জন্য। উদ্দেশ্য হলো, তোমরা তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, আর আমরাও আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করব না’।[৬৬]

‘সবাই যার যার ধর্ম পালন করবে’ এ তাফসীর ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করা মারাত্মক ভুল। কেননা এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য কাফেরকে দ্বীনের প্রতি দা’ওয়াত দিয়েছেন এবং কাফেররাও মুসলমানদেরকে ইসলাম মানার কারণে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের আলোকে উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বর্তমান যুগে পরকালে মুক্তির জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মকেই বেছে নিতে হবে। মুক্তির পথ কেবল ইসলামই।

---

৬৫. মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৫০
৬৬. তাফসীরে মাযহারী: ১০/৩৫৫

অন্যান্য ধর্ম অনুসারীদের মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বিষয় বোঝার তাউফীক দান করুন। আমীন।

খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আকীদা

তাওহীদ ও আখেরাতের পর ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস যে সকল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আকীদা হলো আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত। অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র ধারা সর্ব শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেউ তাঁর পরে নবী হবে না, কারো উপর ওহীও অবতীর্ণ হবে না। এমনকি কারো উপর এমন কোন ইলহামও হবে না যা দ্বীনের ব্যাপারে হুজ্জাত (প্রমাণ স্বরূপ) হবে। ইসলামের এ আকীদাই 'খতমে নবুওয়াত' নামে প্রসিদ্ধ।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর যামানা থেকে এ পর্যন্ত গোটা উম্মত কোন ধরণের নূন্যতম বিবাদ ও মতানৈক্য ছাড়াই এই আকীদাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মেনে আসছে। কুরআনে কারীমের বহু আয়াত এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর অসংখ্য হাদীস এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত।

উলামায়ে উম্মত এ বিষয়ে শক্ত হাতে কলম ধরেছেন এবং রচনা করেছেন বহু কিতাব। হযরত মওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. উর্দূ ভাষায় 'খতমে নবুওয়াত' নামে একটি প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও আসারে সাহাবার আলোকে খতমে নবুওয়াতকে প্রমাণ করেছেন। সংক্ষিপ্ততার কারণে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো না।

তবে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতমে নবুওয়াতের আকীদা সম্পর্কে অসংখ্য বার সতর্ক করার পাশাপাশি এ ভবিষ্যতবাণীও করে গেছেন যে,

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله

অর্থ: কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না যতক্ষণ না ত্রিশের কাছাকাছি দাজ্জাল ও কায্যাব পয়দা হবে, যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দাবি করবে, সে আল্লাহর রাসূল।[৬৭]

অন্যত্র আছে,

إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي

অর্থ: অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যা দাবিদার বের হবে, প্রত্যেকেই এই দাবি করবে যে সে নবী, অথচ আমি সর্ব শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।[৬৮]

তিনি আরো বলেন,

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين

অর্থ: আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এরূপ যে, যেন এক ব্যক্তি একটি ভবন নির্মাণ করলো, এটাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করলো, কিন্তু এক কোণায় একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। লোকজন তার চারপাশে ঘুরে বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগলো, এ ইটটি লাগানো হলো না কেন? (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,) আমিই সে ইট, আর আমিই সর্বশেষ নবী।[৬৯]

বিষয়টি এত স্পর্শকাতর যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ভুল বোঝার কোন সুযোগই রাখেননি। যেমন যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত আলী রাযি. কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। জিহাদে

---

৬৭. সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৬০৯
৬৮. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪২৫২
৬৯. সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৫৩৫

যেতে না পেরে হযরত আলী দুঃখিত হলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي

অর্থাৎ তুমি আমার থেকে এমন, যেমন হযরত হারুন আ. হযরত মূসা আ. থেকে; তবে আমার পরে কোন নবী আসবে না।[৭০]

দেখুন, এখানে হযরত আলী রাযি. কে হযরত হারুন আ. এর সাথে তুলনা করায় কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারে যে, হযরত হারূন আ. যেহেতু নবী ছিলেন তাহলে আলী রাযি.-ও নবী। এ ভুলের সুযোগ না দেয়ার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে বললেন, 'তবে আমার পরে কোন নবী আসবে না'।

উক্ত হাদীসসমূহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের পর যারা নবুওয়াতের দাবি করবে তাদের জন্য 'দাজ্জাল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার শাব্দিক অর্থ হলো, চরম ধোঁকাবাজ।

এ শব্দ ব্যবহার করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে, আমার পর যারা নবুওয়াতের দাবি করবে তারা স্পষ্ট ভাষায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করে কূটকৌশলে কাজ নিবে। মুসলমানের রূপে দিয়ে নবুওয়াতের দাবি করবে এবং এই উদ্দেশ্যে উম্মতের স্বীকৃত আকীদাসমূহে এমনভাবে কাটছাঁট করবে যে বহু লোকই ধোঁকায় পড়ে যাবে। এই চরম ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য উম্মতের একথা স্মরণ থাকা উচিত, আমি 'খাতামুন নাবিয়্যীন' অর্থাৎ আমার পর কেউ নবী হবে না।

ইতিহাসের পাতায় তাকালে আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে যারাই নবুওয়াতের দাবিদার হয়েছে তারা নিজেকে মুসলমান রূপে প্রকাশ করে স্বীয় দাবি প্রচারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসের দিক নির্দেশনা প্রাপ্ত হওয়ায় যখনই নবুওয়াতের কোন ভণ্ড দাবিদার আত্মপ্রকাশ করেছে তাকে কাফের সাব্যস্ত করেছে এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার করেছে।

---

৭০. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৪০৪

নববী যুগ থেকে যখনই কোন ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী আদালতে এ ধরণের মামলা উপস্থিত হয়েছে তখনই বিচারকগণ তার দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণ তলব না করে তার ব্যাপারে কাফের হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। যেমন, মুসাইলামা কায্যাব, আসওয়াদ আনাসী, তুলাইহা, সাজাহ, হারেস। সাহাবায়ে কেরাম তাদের কুফরীর ফায়সালা দেয়ার পূর্বে কখনো নবুওয়াতের দাবির ব্যাপারে তাদের থেকে কোন প্রকার দলীলও তলব করেননি। যখনই কারো পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে তখনই সর্ব সম্মতিক্রমে তাকে কাফের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এর কারণ হলো, খতমে নবুওয়াতের আকীদা এতটাই স্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত যে, এর খেলাফ যুক্তি-তর্ক সব প্রতারণারই শামিল। এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পূর্বেই অবগত করে গেছেন। যদি এ ধরণের কোন ব্যাখ্যর সামান্য অবকাশ দেয়া হয় তাহলে তাওহীদ-আখেরাত কোন আকীদাই নিরাপদ থাকবে না।

অতএব কেউ যদি খতমে নবুওয়াতের এই ব্যাখ্যা দেয়া আরম্ভ করে যে, 'তাশরীঈ' নবুওয়াত আসবে না। তবে 'গায়রে তাশরীঈ' নবুওয়াত এখনও আসতে পারে, তো তার এ কথা এমনই হবে যেমন কেউ এই দাবি করলো যে, তাওহীদের আকীদা অনুযায়ী তো বড় খোদা শুধু এক সত্তাই, কিন্তু ছোট ছোট মা'বূদ অনেক হতে পারে এবং তারা সকলেই উপাসনার উপযুক্ত। (নাঊযুবিল্লাহ)

যদি এ ধরণের অপব্যাখ্যার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, ইসলামে স্বতন্ত্র কোন আকীদা বিশ্বাস, কোন চিন্তা চেতনা, কোন বিধান এবং কোন চারিত্রিক মাপকাঠি নির্ধারিত নেই। বরং এটা এমন একটা পোশাক যা দ্বারা পৃথিবীর নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তিও নিজেকে আবৃত করতে পারে। (নাঊযুবিল্লাহ)

তাই মুসলিম উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাতের মুতাওয়াতের ইরশাদ অনুযায়ী স্বীয় রাষ্ট্রীয় বিধান, আদালতী সিদ্ধান্ত এবং ইজতিমায়ী ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতির উপর আমল করে আসছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যে কেউ নবুওয়াতের দাবি করবে, তাকে এবং তার সকল অনুসারীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে।

সারকথা হলো, 'খতমে নবুওয়াত' এর আকীদা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অস্বীকারকারী কাফের। কেননা নতুন কোন নবী আগমনের যে প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সেই প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট আর দেখা দেয়নি; দেখা দিবেও না।

পূর্বে এক নবীর পর আরেক নবী আগমনের প্রয়োজন এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, পূর্বের নবী সাময়িক ছিলেন বা বিশেষ কোন ভূখণ্ডের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন বা নবী তার সাহায্যার্থে আল্লাহর কাছে কোন নবী চেয়ে নিয়েছিলেন অথবা পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা যদি বিকৃতি বা পরিবর্তনের শিকার হয়েছিলো কিংবা পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা অপূর্ণ ছিলো। আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর এ ধরণের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি; দিবেও না। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর দ্বীন হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।[৭১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ আকীদা পোষণ করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

ইসলাম ও গণতন্ত্র

ইসলামের সূচনা থেকেই মুসলমানদের ঈমান-আমলকে ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু ইয়াহুদী-খ্রিস্টান শক্তি একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। সহীহ ও শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে কোন মুসলমান কবরে যাবে, এটা তাদের সহ্যের বাইরে। তাই তারা যুগে যুগে মুসলমানদের ঈমানকে শিরক মিশ্রিত করার জন্য নানা ধরণের কূটচাল চালিয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, যা সাধারণ ও বিশিষ্ট সবাই বোঝে, কখনো পরোক্ষ ভাবে, যা

৭১. সূরা মায়িদা; আয়াত ৩

সাধারণ তো দূরের কথা বিশিষ্টদেরও বোধগম্য নয়। তবে যুগের যারা সচেতন আলেম, তারা সব সময় সজাগ থেকেছেন এবং উম্মাহর ঈমান-আমলকে কুফর-শিরকের মিশ্রণ থেকে হেফাযত করার জন্য যার পর নাই চেষ্টা মেহনত করে গেছেন। কারণ তারা জানেন যে, নবীর নিয়াবত আর বিরাসতের গুরুদায়িত্ব তাদের কাঁধে অর্পিত হওয়ায় পরকালে তারা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

বর্তমান যামানায় মুসলমানদের ঈমানকে শিরকমিশ্রিত করার জন্য রাজনৈতিক দর্শনের নামে যে সকল মতবাদ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর, যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে। এমনি আরেকটি মতবাদ হলো সমাজতন্ত্র। যার মূলমন্ত্র হলো, সমস্ত সম্পদের মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। জনগণ শ্রম দিবে এবং এর বিনিময়ে সে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি জরুরী জিনিস পাবে। কিন্তু তারা কোন গাড়ি, বাড়ি, শিল্প কারখানার মালিক হতে পারবে না। এ দর্শনটি যে শরী‘আত বিরোধী সে কথা সকলেই বোঝে। কারণ ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে হজ্জ, যাকাতসহ আর্থিক ইবাদতসমূহ কারো উপর ফরয হবে না। ফলে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো অস্বীকার করার দরূন মানুষ কাফের ও বে-ঈমান হয়ে যাবে।

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তকরণের বহু চেষ্টা হয়েছে। সমকালীন উলামায়ে কেরাম তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে উম্মাহর ঈমানকে শিরকের মিশ্রণ থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক দর্শনের মোড়কে গণতন্ত্রের নামে মুসলিম উম্মাহকে মুরতাদ বানানোর যে সূক্ষ্ম চেষ্টা চলছে, তার বাস্তবতা বুঝতে না পারায় এ যুগের উলামায়ে কেরামকেও এব্যাপারে বেশি একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। অথচ গণতন্ত্র স্পষ্ট কুফরীতন্ত্র। এ ব্যাপারে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা সন্দেহ করবে, তাদের ঈমান অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ।

গণতন্ত্র মূলত একটি ধর্ম। বাদশাহ আকবর যেমন হিন্দু-মুসলমানদেরকে এক করার জন্য দীনে ইলাহী নামক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলো, যা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর মেহনতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। অনুরূপভাবে ধূর্ত

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে এক করে তাদের তাবেদার বানানোর জন্য 'গণতন্ত্র' নামক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বাদশাহ আকবর তার মতবাদের নাম দিয়েছিলো 'ধর্ম', আর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা বাদশাহ আকবরের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়ে চালাকি করে ধর্ম শব্দটি বাদ দিয়ে দিয়েছে। যেন দ্বীনদার মুসলমানকেও এ ধর্মের ধারাগুলো অতি সহজে গলধঃকরণ করানো যায়। ইসলাম ধর্মে যেমন কোন অনুমোদিত জিনিসকে জায়েয এবং নিষিদ্ধ জিনিসকে হারাম বলে, অনুরূপভাবে গণতন্ত্র নামক ধর্মে অনুমোদিত জিনিসকে আইনসম্মত এবং নিষিদ্ধ জিনিসকে আইনসম্মত নয় বা বে-আইনি বলে। আর এ ধর্মের খোদা হলো, পরাশক্তির কর্ণধারগণ। অবতার হলো, বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রের কাণ্ডারীগণ। আর এর ফেরেশতা হলো, ফৌজ ইত্যাদি। আর ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে সংবিধান, যা সার্বিকভাবে বোঝার জন্য এবং তার পক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য ইংরেজদের ধর্মনিরপেক্ষ সিলেবাস বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় চালু আছে।

প্রিয় পাঠক! এগুলো শুধু আমাদের মুখের কথা নয়। বরং তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যখন প্রচণ্ড বন্যায় প্লাবিত হয়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়, তখন মার্কিন সরকার সাহায্যের জন্য কয়েক জাহাজ সৈন্য পাঠিয়েছিলো। তাদের নাম দিয়েছিলো, 'অপারেশন সী এঞ্জেল'। যার অর্থ হলো, 'সামুদ্রিক ফেরেশতার মাধ্যমে সহযোগিতা'। এখন আমাদের কথা হলো, যদি মার্কিনীদের ভাষায় গণতন্ত্র ধর্মই না হত, তাহলে ফেরেশতা এলো কোত্থেকে? হ্যাঁ, গণতন্ত্র নামক এ ধর্মের নির্দিষ্ট কোন উপাসনালয় নেই। সুনির্দিষ্ট সময়ে তার সুনির্দিষ্ট কোন ইবাদত নেই। এতটুকু পার্থক্য। আর একারণেই এটা যে একটা ধর্ম, তা লোকেরা বুঝতে পারে না এবং সহজেই তা গ্রহণ করে।

আরো দেখুন, ইসলামী শরী'আতে মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। গণতন্ত্রের ধর্মেও একই নিয়ম। এ মতবাদের সাথে কেউ বিদ্রোহ করলে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। যেমন ধরুন, কিছু খোদাপ্রেমিক ইসলামী শাসনব্যবস্থার দাবিতে কোথাও জড়ো হয়েছে, সরতে চাচ্ছে না, নির্ঘাত তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কারণ তারা গণতন্ত্রের মুরতাদ।

প্রিয় পাঠক! আপনাদের দরদে দরদী হয়ে আমি বলছি, কবরে ও আখেরাতে কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না। আপনারাই বলুন, কেউ যদি হিন্দু কিংবা

খ্রিস্টান অথবা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে বা এ সকল ধর্মের মতবাদে বিশ্বাসী হয় এবং তার মধ্যেই ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি খুঁজে বেড়ায়, তাহলে কি সে মুসলমান থাকতে পারে? কিছুতেই না। তাহলে কেউ যদি গণতন্ত্র নামক ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস করে তার ধারাগুলোর অনুসরণের মধ্যেই পার্থিব উন্নতি তালাশ করে, তাহলে সে কি করে মুসলমান থাকতে পারে? বড় চিন্তার বিষয়। ঈমান তো শুধু মুখে দাবি করার বিষয় নয়। বরং তা অন্তরে বিশ্বাস করার নাম।

এখানে আমরা ইসলামের সাথে সরাসরি সংঘর্ষপূর্ণ গণতান্ত্রিক কিছু ধারা উল্লেখ করছি, যা বিশ্বাস করলে বিশ্বাসকারীর ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই, এমনকি তার ঈমান নষ্টও হতে পারে।

১. গণতন্ত্র বলে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। ইসলাম বলে, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ পাক। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।[৭২]

   অপর আয়াতে আছে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতার মালিক করেন এবং যার থেকে চান, ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন।[৭৩]

২. গণতন্ত্র বলে, অধিকাংশের মতামতেই সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। ইসলাম বলে, অধিকাংশের মতামত সিদ্ধান্তের একটি সূত্র, একমাত্র সূত্র নয়। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাক বার বার ঘোষণা করেছেন, অধিকাংশ মানুষই জ্ঞান রাখে না। অধিকাংশ মানুষই মূর্খ। অধিকাংশ লোকেরই বিবেক-বুদ্ধি নেই। অধিকাংশ মানুষই নাফরমান ইত্যাদি। অথচ অধিকাংশ বা 'মেজরিটি'ই হলো গণতন্ত্রের মূল কথা।

৩. গণতন্ত্র বলে, 'দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক পার্লামেন্ট'। ইসলাম বলে আসমান-যমীনের স্বত্ব একমাত্র আল্লাহর।[৭৪] আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ।[৭৫]

---

৭২. সূরা বাকারা; আয়াত ১৬৫
৭৩. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ২৬
৭৪. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৮০
৭৫. সূরা বাকারা; আয়াত ২৮৪

৪. গণতন্ত্র বলে, পার্লামেন্ট যে কোন সময় যে কোন আইন প্রনয়ণ করার অধিকার রাখে। হোক তা কুরআন বিরোধী।' এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে। সুতরাং এ ধারার আলোকে অধিকাংশ সংসদ সদস্যদের মতামত থাকলে, পার্লামেন্ট মদপান, যিনা, সমকামীতা, আন্তঃধর্ম বিবাহ ইত্যাদিও বৈধ ঘোষণা করতে পারে। ইসলাম বলে, আইন প্রনয়ণের অধিকার একমাত্র আল্লাহর।[৭৬] অন্য আয়াতে এসেছে, আল্লাহ যা করেন এ ব্যাপারে কারো জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই। কিন্তু মানুষ যা করে তার জবাবদিহিতা অবশ্যই তাকে করতে হবে।[৭৭] তো কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোন নবী রাসূলও আইন প্রনয়ণের অধিকার সংরক্ষন করেন না। হ্যাঁ, পার্লামেন্ট আল্লাহ প্রদত্ত আইন জনগণের মাঝে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি বের করার অধিকার রাখে। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

৫. গণতন্ত্র বলে, 'জনগণের মাঝে কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য প্রথমে তা পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে হবে কিংবা গণভোট নিতে হবে।' ইসলাম বলে, কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তকৃত কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে হাক্কানী উলামাদের কাছ থেকে জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এখানে গণভোট বা মতামতের কোন প্রসঙ্গ নেই। যেমন কুরআনে এসেছে, কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়ে গেলে তার ফয়সালা করাতে হলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।[৭৮]

৬. গণতন্ত্র বলে, 'জনগণকে সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা বজায় রাখতে হবে।' আরেকটু পরিষ্কার ভাষায় যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে। ইসলাম বলে, একজন মুসলমানের জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম থেকে আন্তরিকভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া জরুরী। এর এ অর্থ নয় যে, অমুসলিমদের সাথে শত্রুতা রাখতে হবে বা খারাপ ব্যবহার করতে হবে। অমুসলিমদের অধিকারও আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সাথেও বাহ্যিকভাবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ

---

৭৬. সূরা ইউসুফ; আয়াত ৪০
৭৭. সূরা আম্বিয়া; আয়াত ২৩
৭৮. সূরা নিসা; আয়াত ৫৯

দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা থাকবে।'[৭৯]

৭. কেউ যদি ধোঁকা বা প্রতারণার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করে, যেমন সুদ বা জুয়ার মাধ্যমে অনেকে ধনী হচ্ছে, এগুলো গণতন্ত্রের ধর্মে সম্পূর্ণ হালাল এবং ঐ ব্যক্তিকে বুদ্ধিজীবী টাইটেল দেয়া হবে। কারণ সে বুদ্ধি খাটিয়ে সাধারণ লোকদের টাকা হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে এ টাকাগুলো হারাম, এগুলো মূল মালিককে ফেরত দিতে হবে। হাদীস অনুযায়ী এই ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে শামিল নেই এবং ইসলামী আদালত এ ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবে।

প্রিয় পাঠক! ইসলামের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারাগুলোর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। আশা করি এতুটুকুতেই গণতন্ত্রের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছেন। যেখানে কুরআনের বিরুদ্ধে একটি মাত্র আকীদা পোষণ করলে ঈমান থাকে না, সেখানে সরাসরি কুরআন হাদীস বিরোধী এতগুলো ধারা বিশ্বাস করলে কি করে তার ঈমান ঠিক থাকতে পারে?[৮০]

মোটকথা, গণতন্ত্র ঈমান বিধ্বংসী এক মতবাদ বা ধর্ম। কেউ যদি মনে-প্রাণে এর ধারাগুলোকে বিশ্বাস করে, তাহলে নিশ্চিত তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা একেবারেই বিনষ্ট হবে।

---

৭৯. সূরা মুমতাহিনা; আয়াত৪

৮০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ১. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ., মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত ১/১২২, ২. মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী রহ., আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৬ (ইসলামী রাজনীতি অধ্যায়), ৩. মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ রহ., আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/১৯০, ৪. মুফতীয়ে আযম দারুল উলূম দেওবন্দ মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ., ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২০/৪১২-৪১৩।

আমরা যদি আখেরাতের প্রসঙ্গ কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিয়ে শুধু মাত্র দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখি, তারপরও বলতে হবে, গণতন্ত্র একটি ব্যর্থ সমাজ ব্যবস্থা। এর দ্বারা কোন রাষ্ট্র চলতে পারে না। যে সমাজ ব্যবস্থায় একজন সর্বোচ্চ জ্ঞানী ও একজন রিক্সাচালকের মতামত সমপর্যায়ের মনে করা হয়, তার দ্বারা কোন দেশ তো দূরের কথা, সাধারণ একটি প্রাইমারী স্কুলও চলতে পারে না। স্কুলের হেডমাস্টার কে হবেন? সেকেন্ড মাস্টার কে হবেন? এ জন্য কিন্তু এলাকার লোকদের ভোট নেয়া হয় না। বরং এক্ষেত্রে যদি ভোটের কথা বলা হয় তাহলে বলা হয়, মূর্খ লোকেরা এর কি বুঝবে? এ জন্য তো জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষিত লোকদের কমিটি দরকার। তাহলে দেখুন, যে ব্যবস্থা দ্বারা স্কুলের একজন হেডমাস্টার ও প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করা যায় না, তার দ্বারা একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও নীতিনির্ধারক কীভাবে নির্বাচিত হতে পারে? একটি দেশ কি একটি প্রাইমারী স্কুল থেকেও কম গুরুত্ব রাখে?

প্রিয় পাঠক! সারকথা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান বুঝে কিংবা না বুঝে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ইসলামের চির দুশমন ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের তৈরি গণতন্ত্র নামক ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কর্তব্য হলো, মনে-প্রাণে এই গণতন্ত্রকে ভুল মনে করতে হবে। এর কুরআন বিরোধী ধারাগুলোকে সরাসরি কুফর জ্ঞান করতে হবে এবং সাধ্যানুযায়ী দ্বীনী দা'ওয়াত ও তা'লীমের জন্য সময় বের করে মানুষের মাঝে ঈমান আমল পরিশুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক মেহনত চালাতে হবে। এটিই সে পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সব কুফরীতন্ত্রের জোয়াল আমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে সাচ্চা মুসলমান বানাবেন এবং তামাম কুফর-শিরক ও বিদ'আত থেকে আমাদের হেফাযত করবেন; ইনশা-আল্লাহ।

একটি সন্দেহের অপনোদন

প্রিয় পাঠক! কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গণতন্ত্র কুফরীতন্ত্র হয়ে থাকলে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ কেন এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন? এর উত্তরে আমরা বলব, গণতন্ত্রকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা আর বাতিলের ভাষা হিসাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা এক কথা নয়। কারণ তারা গণতন্ত্রের হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদির প্রভাব বোঝে এবং এটাকে ভয় পায়। কিন্তু আমাদের আকাবিরগণ গণতন্ত্রকে সর্বদা কুফরীতন্ত্র হিসাবেই বিশ্বাস

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

করতেন। তবে বিভিন্ন সময় দ্বীন-ইসলামকে রক্ষার স্বার্থে বাতিলের ভাষা হিসাবে তাঁরা সাময়িকভাবে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং উম্মতের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাতিলের মুকাবেলা করেছেন।

উল্লেখ্য, যতদিন এ মুসীবত দূর না হবে, ততদিন একান্ত ঠেকায় পড়ে, বড় অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তুলনামূলক ভালো লোককে ভোট দিতে চাইলে দেয়ার অবকাশ রয়েছে। তবে আন্তরিকভাবে কখনোই এ মতবাদকে বৈধ মনে করা যাবে না।

ঈমানকে হেফাযতের লক্ষ্যে কথাগুলো নিজে বুঝবো এবং অপরকে বোঝাবো। সেই সাথে লোকদের ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করার জন্য যার যার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পাশাপাশি আল্লাহর দরবারে নিয়মিত দু'আ করতে থাকবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ ঈমান ও হেদায়াতের উপর কায়েম থাকার তাউফীক দান করেন। আমীন।

বাংলাদেশে পরিচিত ভণ্ডপীরদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও তার খণ্ডন

মুসলিম জনসাধারণের সরলতা এবং ধর্মের প্রতি সহজাত দুর্বলতাকে পুঁজি করে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির হীন উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর অসাধু ভণ্ডপীর আজ মুসলমানদের ঈমান-আমল ধ্বংসের উদ্দেশ্যে খানকাহ ও দরবার খুলে বসেছে। তাই মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমল-আখলাকের হেফাযতের উদ্দেশ্যে এ সকল ভণ্ডপীরের ভণ্ডামী সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবগতি আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নিম্নে এ দেশের পরিচিত ভণ্ডপীরদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও তার সংক্ষিপ্ত খণ্ডন পেশ করা হলো।

এনায়েতপুরী ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস

এনায়েতপুরীর নাম মাওলানা শাহ সূফী মুহাম্মাদ ইউনুস আলী। তার পিতার নাম মাওলানা শাহ সূফী আব্দুল কারীম। সে ১৩০০ হিজরীতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানার এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে।

এনায়েতপুরী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস

১. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, শুধু মীম হরফ ছাড়া। আল্লাহ তা'আলা হলেন আহাদ। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আহমাদ।[৮১]

খণ্ডন: হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর খোদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বললে আল্লাহ তা'আলারও স্ত্রী ও সন্তানাদী আছে বলতে হবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ও সন্তান তখন আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী-সন্তান বলে গণ্য হবে। (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন শরীফে (সূরা ইখলাস) এসেছে,

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।[৮২]

২. এনায়েতপুরীর আকীদা হলো, ভালো-মন্দের ক্ষমতা পীর সাহেবের হাতে আছে।[৮৩]

খণ্ডন: এটা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন, সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। এই সম্প্রদায়ের কী হলো যে, তারা কোন কথা বুঝতেই পারে না।[৮৪]

৩. এনায়েতপুরীর অনুসারীরা তাকে প্রায় নবী আ. এর সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে। তাদের ধারণায় যে ব্যক্তি এনায়েতপুরীর সাক্ষাত পেয়েছে, সে জান্নাতী।[৮৫]

প্রিয় পাঠক! এ ভ্রান্ত আক্বীদার খণ্ডনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ এটা স্বীকৃত যে, কাউকে দেখার মাধ্যমে জান্নাতী হওয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু

---

৮১. পুষ্পহার; পৃষ্ঠা ৩৬, ১২তম সংস্করণ
৮২. সূরা ইখলাস; আয়াত ৩-৪
৮৩. পুষ্পোদ্যান; পৃষ্ঠা ৭৬
৮৪. সুরা নিসা; আয়াত ৭৮
৮৫. পুষ্পহার, ১২তম সংস্করণ; পৃষ্ঠা ৩৭

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস, তাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবদ্দশায় দেখা এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার শর্তে। তাছাড়া হাদীসে আছে,

من بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه

অর্থাৎ যার আমল তাকে পিছনে ফেলেছে তার বংশ-মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারেনি।[৮৬]

মাইজভাণ্ডারী পীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চট্টগ্রাম 'মাইজভাণ্ডার' দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আহমাদুল্লাহ। তার পিতার নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ। তিনি ১২৩৩ বাংলা ১লা মাঘ মোতাবেক ১৮২৬ ইংরেজী রোজ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। তার ঈমান বিধ্বংসী কুফরী আকীদাগুলো নিম্নরূপ।

মাইজভাণ্ডারীর আকীদা

১. পীর সাহেব মনের আশা পূরণ করেন এবং পরকালে মুক্তি দিবেন।[৮৭]

২. মাইজভাণ্ডারীর ভণ্ডপীর বলে থাকে, গান-বাজনা জায়েয।[৮৮]

অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা সম্পূর্ণরূপে হারাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف

অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে।[৮৯]

উল্লিখিত আকীদা ছাড়াও আরো অনেক ঈমান বিধ্বংসী আকীদায় বিশ্বাসী মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার মুরীদরা। কাজেই এ ভ্রান্ত দল থেকে নিজের ঈমান-আমল হেফাযত করা আবশ্যক।

সুরেশ্বরী পীরের পরিচিতি

---

৮৬. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬৯৯
৮৭. রত্ন ভান্ডার, খণ্ড ১; পৃষ্ঠা ১৭-২৭ ও ৩৩, অষ্টম সংস্করণ
৮৮. মীলাদে নবী ও তাউয়াল্লুদে গাউছিয়া; পৃষ্ঠা ৪
৮৯. সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৫৯০

‘সুরেশ্বর’ শরীয়তপুর জেলার নাড়িয়া থানার একটি গ্রাম। এখানকার শাহ সূফী সৈয়দ জান শরীফ শাহ ‘সুরেশ্বরী পীর’ নামে খ্যাত। বর্তমানে সুরেশ্বরী পীরের অধঃস্তন উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে সুরেশ্বর চৌধুরীপাড়া, ঢাকাতে অবস্থিত।

সুরেশ্বরীর ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস

তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক আকীদা হচ্ছে,

১. পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন ইবাদত কবুল হয় না।[৯০]

এখানে বাইআত হওয়াকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শর্ত তথা ফরয করা হয়েছে। অথচ কোন কিছুকে ফরয সাব্যস্ত করতে হলে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা থাকা আবশ্যক, যা এখানে অনুপস্থিত। বাইআত হওয়াকে উলামায়ে কেরাম সুন্নাত বলেছেন। অতএব পীর ধরাকে ফরয বলা কোন দলীল ছাড়া শরী‘আতের মধ্যে অতিরঞ্জন করা, যা শরী‘আত বিকৃত করার ন্যায় জঘন্য অপরাধ। হাদীসে আছে,

عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد.

অর্থঃ হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়।[৯১]

২. চন্দ্রপুরীর মত ভণ্ডপীর সুরেশ্বরীর মতেও কামেল ওলীর কোন ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না।[৯২]

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন তথা তিনি সকল অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর চোখের সামনে বিদ্যমান।[৯৩]

---

৯০. নূরে হক গঞ্জে নূর, সংস্করণ ১৯৯৮; পৃষ্ঠা ২৫
৯১. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৬৯৭
৯২. নূরে হক গঞ্জে নূর, সংস্করণ ১৯৯৮; পৃষ্ঠা ১৩৩
৯৩. মাসিক সুরেশ্বর; পৃষ্ঠা ৮, চতুর্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

খণ্ডন: কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আছে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই আছে। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন, যত মাখলূক আসমান এবং যমীনে রয়েছে, তাদের কেউ গায়েব জানে না একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া। আর (এ কারণেই) তারা জানে না, তারা কবে পুনরুত্থিত হবে?[৯৪]

আটরশী পীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আটরশীর 'বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের' প্রতিষ্ঠাতা জনাব হাশমত উল্লাহর জন্ম হয় জামালপুর জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত পাকুরিয়া গ্রামে। তারপর ভণ্ডপীর এনায়েতপুরীর নির্দেশে ফরীদপুরে এসে 'জাকের ক্যাম্প' নামে সে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। পরবর্তীকালে এটারই নাম দেয়া হয় 'বিশ্ব জাকের মঞ্জিল'।[৯৫]

আটরশীর ঈমান বিধ্বংসী আকীদাসমূহ

১. আটরশীর ভণ্ডপীরের বক্তব্য হলো, পরকালে পীর সাহেব মুরীদদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।[৯৬]

অথচ স্বয়ং নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোত্রের লোক বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালিবসহ নিজ কন্যা ফাতিমা রাযি. কেও বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেরা করে নাও। আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না'।[৯৭]

২. দেওয়ানবাগী ভণ্ডপীরের মত আটরশীর এ ভণ্ডও মনে করে যে, পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকীয়তা নেই।[৯৮]

---

৯৪. সূরা নাম্‌ল; আয়াত ৬৫, আরো দেখুন: সূরা আনআম; আয়াত ৫০, ৫৯
৯৫. বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি, ২০তম সংস্করণ
৯৬. শাহ সূফী হযরত ফরীদপুরী সাহেবের নসীহত, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩নং পৃষ্ঠা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯৮ ইং
৯৭. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২০৪
৯৮. তাসাউউফ, তত্ত্ব ও পর্যালেচনা; পৃষ্ঠা ১৪৭, প্রকাশকাল ২০০০ ইং

কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনামতে স্বচ্ছ ঈমানের দাবি হলো, মানুষের ভালো-মন্দ, সফলতা-ব্যর্থতা, ইজ্জত-সম্মান সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার অধীনে।[৯৯]

৩. অথচ ভণ্ডপীর আটরশীর কথা হলো, ভালো-মন্দের ক্ষমতা পীর সাহেবের হাতে।[১০০]

এতসব কুফরী আকীদা সম্বলিত ব্যক্তি কীভাবে মানুষের পথনির্দেশক পীর হতে পারে? কাজেই 'বিশ্ব জাকের মঞ্জিল' এর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

চন্দ্রপুরী পীরের পরিচিতি

ফরীদপুর জেলার চন্দ্রপাড়া গ্রামের মৌলভী সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান (মৃত ১৯৮৪ খ্রি.) 'চন্দ্রপাড়ার পীর' নামে খ্যাত। তিনি শাহ সূফী এনায়েতপুরীর শিষ্য। তিনি দেওয়ানবাগী পীর মাহবূবে খোদার পীর ও শ্বশুর।

চন্দ্রপুরীর ঈমান বিধ্বংসী আকীদাসমূহ

১. ভণ্ড চন্দ্রপুরী বলে থাকে, হযরত জিবরীল আ. ও আল্লাহ তা'আলা এক ও অভিন্ন। চন্দ্রপাড়া পীরের জামাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আত্মার বাণী' ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় আছে, 'সুলতানিয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমান, জিবরীল আ. বলতে অন্য কেহ নন। স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ'। (নাউযুবিল্লাহ)।

অথচ পবিত্র কুরআনে[১০১] স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে যে, জিবরীল আ. আল্লাহ ভিন্ন পৃথক সত্তা। আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী নিয়ে রাসূলের নিকট আগমনকারী ফেরেশতা।[১০২]

২. ভণ্ড চন্দ্রপুরীর আরেকটি কুফরী আকীদা হলো, বড় বুযুর্গদের ইবাদত লাগে না।[১০৩]

---

৯৯. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ২৬, সূরা ইউনুস; আয়াত ১০৫
১০০. শাহ সূফী হযরত ফরীদপুরী সাহেবের নসীহত, ৩য় খণ্ড; পৃষ্ঠা ১১১, ৩য় মুদ্রণ
১০১. সূরা বাকারা; আয়াত ৯৮
১০২. সূরা শু'আরা; আয়াত ১৯২
১০৩. হাক্কুল ইয়াকীন; পৃষ্ঠা ২৯

অথচ পবিত্র কুরআনে কারীমে স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করুন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।[১০৪]

আল্লাহ তা'আলার নবীর সমান ইয়াকীন এবং বিশ্বাস অর্জন করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি আজীবন নবীকে শরী'আতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজন উম্মত এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোত্থেকে পেল যে, সে শরী'আতের অনুসরণ হতে মুক্ত হয়ে যাবে?

৩. ভণ্ড চন্দ্রপুরী আরো বলে থাকে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করেন। (নাঊযুবিল্লাহ)[১০৫]

অথচ কুরআনে ফেরেশতাগণের গুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে যে,

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না। এবং যা তাঁদেরকে আদেশ করা হয় তা পালন করেন।[১০৬]

চন্দ্রপুরী ও তার অনুসারীগণ এ ধরণের অনেক কুফরী আকীদা-বিশ্বাসে লিপ্ত। কাজেই আমাদেরকে এ ভণ্ডের প্রতারণা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা আবশ্যক।

দেওয়ানবাগীর পরিচিতি

দেওয়ানবাগী ভণ্ডপীর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। তার নাম মাহবূবে খোদা। ঢাকার অদূরে 'দেওয়ানবাগ' নামক স্থানে একটি এবং আরামবাগ, ঢাকাতে 'বাবে রহমত' নামে আরেকটি দরবার স্থাপন করেছে। মাহবূবে খোদা নিজে এবং তার ভক্তবৃন্দ তাকে 'সুফি সম্রাট' হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

---

১০৪. সূরা হিজ্‌র; আয়াত ৯৯
১০৫. আত্মার বাণী, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; পৃষ্ঠা ২৫
১০৬. সূরা তাহরীম; আয়াত ৬

দেওয়ানবাগীর ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা

১. ভণ্ড দেওয়ানবাগী মনে করে, মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরুরী নয়। সে বলে, ইসলাম বা মুসলিম কোন ব্যক্তি বা ধর্মের নাম নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিধান এবং বিধান পালনকারীর নাম। যে কোন অবস্থানে থেকে এই বিধান পালন করতে পারলেই তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা যায়।[১০৭]

অথচ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা মতে পরকালীন মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করা।[১০৮]

২. সে জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, কিরামান কাতিবীন, মুনকার-নাকীর, ফেরেশতা, হুর ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ এগুলোর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছে, যা এগুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর।[১০৯]

অথচ এগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, নিঃসন্দেহে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।[১১০]

৩. ভণ্ড দেওয়ানবাগী দাবি করে যে, কাবা শরীফ তার কাছে উপস্থিত। তাই হজ্জের প্রয়োজন নেই।[১১১]

অথচ ইসলামে হজ্জ পালন করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয।[১১২] এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফরী।

এতসব কুফরী আকীদা সত্ত্বেও ভণ্ড দেওয়ানবাগী নিজেকে বর্তমান যামানার মহান সংস্কারক, মুজাদ্দেদ, শ্রেষ্ঠতম আল্লাহর ওলী দাবি করে থাকে এবং এ মিথ্যা দাবির প্রমাণ স্বরূপ শিরকী আকীদা সম্বলিত বিভিন্ন স্বপ্ন উল্লেখ করে থাকে। একজন মুসলমান হিসাবে এ বিবেচনা থাকা উচিত যে, একজন কুফরী আকীদার ভণ্ডপীর কীভাবে আল্লাহর ওলী হতে পারে?

---

১০৭. আল্লাহ কোন্ পথে? ৩য় সংস্করণ ১২/১৯৯৬; পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬
১০৮. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৮৫
১০৯. আল্লাহ কোন্ পথে? গ্রন্থের ভূমিকা
১১০. আকাইদুল ইসলাম
১১১. আল্লাহ কোন্ পথে? মে -৯৭ ইং, ২য় সংস্করণ; পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩
১১২. সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৯৭

রাজারবাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তার মতাদর্শ

রাজারবাগী পীর দিল্লুর রহমান। বর্তমানে সে রাজারবাগের মুহাম্মাদীয়া ও সুন্নাতী জামে মসজিদ দরবারে অবস্থান করছে।

তার ঈমান বিধ্বংসী কয়েকটি আকীদা

১. সে নিজের নামের আগে-পরে প্রায় ৫২টি উচ্চ অর্থ সম্পন্ন খেতাব সংযুক্ত করেছে। সে বলে, এর মধ্য হতে অনেকগুলো খেতাব তাকে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। বাকিগুলো দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (নাঊযুবিল্লাহ)

- নিজেকে ইমামুস সিদ্দীকীন অর্থাৎ সিদ্দীকগণের ইমাম বলে থাকে এবং এর মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর চেয়েও ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থান দিয়ে থাকেন। কাজেই তার ভণ্ড হওয়ার জন্য এ উপাধিই বড় প্রমাণ।

- সে 'হাবীবুল্লাহ' খেতাব ব্যবহার করেছে। অথচ 'হাবীবুল্লাহ' বলতে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বোঝানো হয়।

- তার খেতাবগুলোর মধ্যে কুফরী জ্ঞাপক খেতাবও রয়েছে। যেমন 'কাইয়ূমুয যামান' খেতাবটি আল্লাহ তা'আলার নাম 'কাইয়ূম' থেকে নেয়া, যার অর্থ হচ্ছে 'জগতের ধারক ও রক্ষক'। তাহলে 'কাইয়ূমুয যামান' অর্থ দাঁড়াচ্ছে যামানার রক্ষক। এ কথাটি কেবল আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। কোন মাখলূক কাইয়ূম হতে পারে না। হলে আব্দুল কাইয়ূম (জগতের রক্ষকের বান্দা) হতে পারে। সুতরাং কোন মানুষের জন্য নিজেকে সংশ্লিষ্ট অর্থের ধারক মনে করে এমন উপাধি গ্রহণ নিঃসন্দেহে কুফরী।

২. মাসিক 'আল-বাইয়িনাত' সম্পর্কে সে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, 'আল-বাইয়িনাত' জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে, আল্লামা রূমী রহ. এর মসনবী শরীফকে যেমন ফার্সী ভাষার কুরআন শরীফ বলা হয়, তদ্রূপ আল-বাইয়িনাতও যেন বাংলা ভাষার কুরআন শরীফ। (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ কুফরী আকীদা সম্বলিত পত্রিকা আল বাইয়িনাতকে কুরআন বলা নিঃসন্দেহে কুফরী কথা।

৩. মাসিক ‘আল-বাইয়িনাত’ পত্রিকায় উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন গালি-গালাজ লেখা হয়, যা কোন ভদ্রতা ও শালীনতার আওতায় পড়ে না।[১১৩]

অথচ গালি-গালাজ করা ফিস্‌ক ও হারাম। হাদীসে বলা হয়েছে,

سباب المسلم فسوق

অর্থাৎ মুসলামনকে গালি দেয়া ফাসেকী।[১১৪]

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বাংলাদেশের পরিচিত ভণ্ডপীরদের কিছু বিভ্রান্তি তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদেরকে এসব ভণ্ড থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

যুগশ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ উলামায়ে কেরাম সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন

বস্তুতঃ এটাই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার নিরাপদ পথ ও পন্থা

কুরআন-সুন্নাহ ও তা থেকে আহরিত সকল বিধি-বিধান মেনে চলার মধ্যেই মুসলমানদের দো’জাহানের শান্তি ও কামিয়াবী নিহিত। তবে কুরআন-সুন্নাহর কিছু বিধান সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝতে সক্ষম; আর কিছু বিধান সংক্ষিপ্ততা ও সূক্ষ্মতার কারণে সবাই বুঝতে সক্ষম নয়। আবার কিছু বিধান বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত, সূক্ষ্ম ও বাহ্যবিরোধপূর্ণ বিধানসমূহের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে দু’টি পথ খোলা আছে। হয়তো নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বুঝ মত সমাধান বের করে সে অনুযায়ী আমল করব, অথবা উম্মাহর স্বীকৃত সর্বোত্তম যুগের ইমামগণের দেয়া সমাধান মেনে চলব। ইনসাফ ও বাস্তবতার বিচারে প্রথমটি আশঙ্কাপূর্ণ ও ভয়ানক, আর দ্বিতীয়টি সতর্কতাপূর্ণ ও নিরাপদ। এ জন্যই গোটা মুসলিম উম্মাহ হাজার বছর ধরে সর্বোত্তম

---

১১৩. আল বাইয়িনাত, সংখ্যা ৬৪-৭০ এবং বয়ানের ক্যাসেট
১১৪. সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৮

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

যুগের সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করে আসছে। তাদের ব্যাখ্যা ও মতামতগুলোই আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় পরবর্তীকালে চার মাযহাবের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। যেগুলো 'হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব' নামে পরিচিত।

সুতরাং মাযহাব কোনো নতুন জিনিস নয়। খায়রুল কুরূনের পর থেকে সকল মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ কোনো না কোনো ইমামের ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন-সুন্নাহ মেনে আসছেন। তাঁরা সবাই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বড় বড় কলেবরে রচিত যুগের ক্রমধারা অনুযায়ী এ যাবতকালের সকল মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মাযহাব ভিত্তিক জীবনীগুলোই এর প্রমাণ। এখানে মৃত্যু-সনসহ শাস্ত্রজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মাযহাব ভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো।

কুতুবে সিত্তাহ-এর লেখকগণ যে মাযহাবের অনুসারী ছিলেন

কিতাব	লেখক	মৃত্যু	মাযহাব
১. সহীহ বুখারী	ইমাম বুখারী	২৫৬ হি.	শাফেয়ী
২. সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম	২৬১ হি.	শাফেয়ী
৩. সুনানে আবূ দাউদ	ইমাম আবূ দাউদ	২৭৫ হি.	হাম্বলী
৪. সুনানে নাসায়ী	ইমাম নাসায়ী	৩০৩ হি.	হাম্বলী
৫. জামে' তিরমিযী	ইমাম তিরমিযী	২৭৯ হি.	শাফেয়ী
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম ইবনে মাজাহ	২৭৫ হি.	শাফেয়ী

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আহকামুল কুরআন	আবূ বকর আহমদ বিন আলী আল জাস্‌সাস	৩৭০ হি.
২. তাফসীরে সমরকন্দী	নসর ইবনে মুহাম্মাদ	৩৭৩ হি.
৩. তাফসীরে নাসাফী	আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ	৭০১ হি.
৪. তাফসীরে আবিস সাঊদ	মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুস্তফা	৯৫২ হি.
৫. তাফসীরে মাযহারী	কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী	১২২৫ হি.

৬. রুহুল বয়ান	ইসমাঈল হক্কী	১১২৭ হি.
৭. রুহুল মাআনী	শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আলূসী	১২০৭ হি.
৮. বয়ানুল কুরআন	আশরাফ আলী থানবী	১৩৬২ হি.
৯. মাআরিফুল কুরআন	মুফতী মুহাম্মাদ শফী	১৩৯৬ হি.
১০. মাআরিফুল কুরআন	মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী	১৩৯৪ হি.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আহকামুল কুরআন	মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আন্দালূসী	৫৪৩ হি.
২. তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ	আব্দুল হক ইবনে গালেব	৫৪৬ হি.
৩. আল জাওয়াহিরুল হিসান	আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আস সাআলাবী	৮৭৬ হি.
৪. তাফসীরে কুরতুবী	মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী	৬৭১ হি.
৫. আল বাহরুল মুহীত্ব	মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আন্দালূসী	৭৪৫ হি.
৬. আদ দুর্‌রুল মাছনূন	আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন	৭৫৪ হি.
৭. তাফসীরে ইবনে উরফাহ	ইবনু উরফাহ	৮০৩ হি.

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. তাফসীরে ত্ববারী	আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-ত্ববারী	৩১০ হি.
২. তাফসীরে বাগাবী	হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বাগাবী	৫১৬ হি.
৩. তাফসীরে কাবীর	মুহাম্মাদ ইবনে উমর আর রাযী	৬০৬ হি.
৪. তাফসীরে বাইযাবী	আব্দুল্লাহ ইবনে বাইযাবী	৬৮৫ হি.
৫. তাফসীরে খাযেন	আব্দুল্লাহ ইবনে খাযেন	৭৪১ হি.
৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর	ইসমাঈল ইবনে আমর দিমাশকী	৭৭৪ হি.
৭. তাফসীরে জালালাইন	জালালুদ্দীন মুহাল্লী	৮৬৪ হি.
৮. তাফসীরে জালালাইন	জালালুদ্দীন সুয়ূতী	৯১১ হি.

৯. তাফসীরে খতীব	মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ শিরবীনী	৯৭৭ হি.

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. তাফসীরে লুবাব	ইবনে আদেল আবী হাফস	৮৮০ হি.
২. তাহকীকু তাফসীরিল ফাতেহা	ইবনে রজব হাম্বলী	৭৯৫ হি.
৩. আত তাফসীরুল কায়্যিম	ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া	৭৫১ হি.

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. কিতাবুল আসার	ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.	১৮২ হি.
২. মুয়াত্তা	ইমাম মুহাম্মাদ রহ.	১৮৯ হি.
৩. ত্বহাবী শরীফ	ইমাম ত্বহাবী	৩১১ হি.
৪. কিতাবুল জিহাদ	আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক	১৮১ হি.
৫. মুসনাদে আবূ ইয়া’লা	আবূ ইয়া’লা আল মূসিলী	৩০৭ হি.
৬. ইকমালু তাহযীবিল কামাল	আলাউদ্দীন মুগলতায়ী	৭৬২ হি.
৭. আল জাওহারুননাকী	আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী	৭৪৫ হি.
৮. উমদাতুল ক্বারী	বদরুদ্দীন আল আইনী	৮৫৫ হি.
৯. মিরক্বাত	মুল্লা আলী কারী	১০১৪ হি.
১০. তারীখে ইবনে মাঈন	ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন	২৩৩ হি.
১১. নাসবুর রায়া	ইউসুফ যাইলাঈ	৭৬২ হি.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আত্ তামহীদ	ইবনে আব্দিল বার মালেকী	৪৬৩ হি.
২. আরিযাতুল আহ্ওয়াযী	আবূ বকর ইবনুল আরাবী	৫৪৩ হি.

৩. শরহুয যুরকানী	আবূ আব্দিল্লাহ আয যুরকানী	১১২২ হি.

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. সহীহ ইবনে হিব্বান	ইবনে হিব্বান	৩৫৪ হি.
২. সহীহ ইবনে খুযাইমা	ইবনে খুযাইমা	৩১১ হি.
৩. মুসনাদে ত্বয়ালিসী	আবূ দাউদ আত ত্বয়ালিসী	২০৪ হি.
৪. সুনানে দারাকুতনী	আলী ইবনে উমর আদ দারাকুতনী	৩৮৫ হি.
৫. সুনানে বাএটাকী	আবূ বকর আল বাএটাকী	৪৫৮ হি.
৬. মুসতাদরাকে হাকেম	হাকেম আবূ আব্দিল্লাহ	৪০৫ হি.
৭. আল কামেল ফিত তারীখ	ইবনুল আসীর	৬০৬ হি.
৮. রিয়াযুস সালিহীন	মুহিউদ্দীন আন নববী	৬৭৬ হি.
৯. তাহযীবুল কামাল	আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী	৭৪২ হি.
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায	শামসুদ্দীন আয যাহাবী	৭৪৮ হি.
১১. ফাতহুল বারী	হাফেয ইবনে হাজার	৮৫২ হি.
১২. ফাতহুল মুগীছ	হাফেয শাসুদ্দীন আস সাখাবী	৯০২ হি.
১৩. তারীখে দিমাশ্‌ক্ব	ইবনে আসাকির	৫৭১ হি.
১৪. তারীখে বাগদাদ	আবূ বকর আল বাগদাদী (খতীব)	৪৬৩ হি.

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. সুনানে দারেমী	আবূ আব্দির রহমান আদ দারেমী	২৫৫ হি.
২. শরহু ইলালিত তিরমিযী	ইবনু রজব হাম্বলী	৭৯৫ হি.

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আল মাবসূত	আবূ বকর আস সারাখসী	৪৯০ হি.

২. মুখতাসারুল কুদুরী	আবুল হাসান কুদূরী	৪২৮ হি.
৩. ফাতহুল ক্বাদীর	কামাল ইবনুল হুমাম	৮৬১ হি.
৪. আল বাহরুর রাইক্ব	ইবনে নুজাইম	৯৭০ হি.
৫. বাদাইউস্ সানায়ে	আলাউদ্দীন আল কাসানী	৫৮৭ হি.
৬. ফাতাওয়ায়ে শামী	ইবনে আবেদীন	১২৫২ হি.
৭. মাজমাউল আনহুর	আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শাইখী যাদাহ	১০৭৮ হি.
৮. আদ্ দুর্‌রুল মুখতার	আলাউদ্দীন আল হাসকাফী	১০৮৮ হি.

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আল ইহকাম	শিহাবুদ্দীন আল কারাফী	৬৮৪ হি.
২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ	ইবনে রুশদ	৫৯৫ হি.
৩. মাওয়াহিবুল জালীল	মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আর রুআইনী	৯৫৪ হি.
৪. মুখতাসারুল আলামাহ	খলীল ইবনে ইসহাক আল জুনদী	৭৬৭ হি.
৫. আল মাদ্‌খাল	ইবনুল হাজ্জ	৭৩৭ হি.
৬. হাশিয়াতুদ দুসূকী	মুহাম্মাদ আদ দুসূকী	১২৩০ হি.

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আত্ তাবসিরাহ	আবূ ইসহাক আশ শিরাজী	৪৭৬ হি.
২. আল হাবিউল কাবীর	আবুল হাসান আল মাওয়ারদী	৪৫০ হি.
৩. আল বদরুল মুনীর	ইবনুল মুলাক্কিন	৮০৪ হি.
৪. আল ওয়াসীত ফিল মাযহাব	ইমাম গাজালী	৫০৫ হি.
৫. আল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ	ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালেক	৪৭৮ হি.
৬. নিহায়াতুল মুহতাজ	শামসুদ্দীন আর রমলী	১০০৪ হি.

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এবং তাদের লিখিত কিতাবসমূহ

কিতাব	লেখক	মৃত্যু
১. আল মুগনী	ইবনে কুদামা	৬২০ হি.
২. আল আদাবুশ শারইয়্যাহ	ইবনে মুফলিহ	৭৬৩ হি.
৩. আল-উদ্দাহ শারহুল উমদাহ	আব্দুর রহমান বিন ইবরাহীম আল মাকদেসী	৬২৪ হি.
৪. মানারুস সাবীল	ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ	১৩৫৩ হি.
৫. তাবীলু মুখতালিফুল হাদীস	ইবনে কুতাইবা	১০৩৩ হি.
৬. মিনহাজুস সুন্নাহ	ইবনে তাইমিয়াহ	৭২৮ হি.

মুসলিম উম্মাহর এ সকল প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহসহ সকল প্রকার ইলমের ভাণ্ডার। তাদের কাছে উম্মত সর্বোতভাবে ঋণী এবং যাদের ইলম থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিমুখ হওয়ার কল্পনা করাও উম্মতের জন্য অসম্ভব। বলা বাহুল্য, তাঁরা সকলেই ছিলেন কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী। এখন এ সকল ব্যক্তিবর্গ যদি শুধুমাত্র মাযহাব মানার কারণে কিছু লা-মাযহাবী বন্ধুর দাবি অনুযায়ী মুশরিক হয়ে থাকেন; তাহলে তারা কীভাবে এ সকল মুশরিকদের (নাউযুবিল্লাহ) কিতাব থেকে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহসহ অন্যান্য ইলম গ্রহণ করছেন? আসলে 'মাযহাব মানলে মুশরিক হয়ে যায়' এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। বরং খায়রুল কুরূন থেকে এ যাবতকাল মুসলিম উম্মাহ কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে।

অতএব যারা কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ পড়েই মুজতাহিদ-ইমাম বনে যাচ্ছেন, তাদেরকে তাদেরই একজন ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবীর বিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া ভাল মনে হচ্ছে। তিনি তার 'ইশাআতুস সুন্নাহ'তে বলেছেন, 'আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা হলো– যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া স্বাধীন মুজতাহিদ বনে যায়, অর্থাৎ মাযহাব ত্যাগ করে; শেষ পর্যন্ত সে দ্বীন থেকেই বের হয়ে যায়।'[১১৫]

---

১১৫. ইশাআতুস সুন্নাহ, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা ৪ (১৮৮৮ ইং)

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার ও অটল থাকার তাউফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

কুরআন হাদীসের শুধু তরজমা পড়ে আমল করা গোমরাহী; বরং আমল করতে হবে কুরআন-হাদীসের সর্বশেষ নির্দেশ তথা 'সুন্নাহ'র উপর

পাঠক, এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে। বর্তমানে অনেকে সুন্নাহর ওপর চলার দাবি করেন কিন্তু সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে নিজেরাও গোমরাহ হচ্ছেন, অন্যকেও গোমরাহ করছেন।

এ বিষয়ে প্রথম নিবেদন হলো, দ্বীন-ইসলামের বিধান একদিনে পূর্ণতা লাভ করেনি; বরং তা দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা এবং সার্বজনীনতা লাভ করেছে। একেকটি বিধান পর্যায়ক্রমে একাধিকবার নাযিল হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। উম্মতের জন্য আমলযোগ্য হলো কুরআন-সুন্নাহর সর্বশেষ হুকুম। আর আমলযোগ্য এ সর্বশেষ হুকুমকেই 'সুন্নাহ' বলা হয়ে থাকে। শুরু যামানার বিধানগুলো- যা পরবর্তী সময়ে রহিত হয়ে গেছে, সে সব বিধানগুলো 'হাদীস' হলেও তা সুন্নাহ তথা আমলযোগ্য নয়।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেইশ বছরের যিন্দেগীর সকল ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। সুন্নাহ তথা সর্বশেষ নাযিলকৃত বিধি-বিধান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রহিত হয়ে যাওয়া প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন 'হাদীস'। বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কেউ যদি শুধু অনুবাদ নির্ভর হয়ে আমল করতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে গোমরাহীর সম্মুখীন হবে। আমাদের অনেক ভাই জুমু'আর দিন মসজিদে এসে খুতবা চলা অবস্থায় নামায পড়া আরম্ভ করে। মনে হয় যেন খতীব সাহেবের সাথে মোকাবেলা করতে এসেছে। মূলত তারা কুরআন হাদীসের অনুবাদ পড়ে আমল করে। উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনবোধ করে না। কুরআন হাদীসে থাকলেই আমল করতে হবে এই চিন্তাটাই গলত; বরং আমল করতে হবে কুরআন-হাদীসের সর্বশেষ বিধান তথা সুন্নাহর উপর।

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনের একাধিক আয়াত এবং হাদীসের কিতাব হতে বেশ কয়েকটি হুকুম উল্লেখ করবো, যে হুকুম-আহকাম প্রাথমিক যামানায় থাকলেও পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যাওয়ায় এখন উম্মতের জন্য তা আমলযোগ্য নয় এবং এ কারণেই কেবল কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পড়ে যেমন আমল করা বৈধ নয়, তেমনি শুধু হাদীসের তরজমা পাঠ করে আমল করাও জায়েয নয়।

শুধু কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পড়ে আমল করা বৈধ নয়

কুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়, তারাবীহতে যা তিলাওয়াত না করলে খতম পূর্ণ হয় না। এতদসত্ত্বেও সে আয়াতে উল্লিখিত বিধানাবলী রহিত হয়ে যাওয়ায় তার উপর আমল করা উম্মতের জন্য জায়েয নয়।

প্রথম আয়াত : আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, আর তার ধন-সম্পদও থেকে থাকে, তাহলে সে তার মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করে যাবে। মুত্তাকীনদের জন্য এটি অবশ্য করণীয়।

অথচ এ আয়াতের উপর আমল করা হারাম–সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াত দ্বারা মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সকলের অংশ খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আয়াতদ্বয় নাযিল হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এখন থেকে নির্ধারিত অংশের হকদারদের জন্য ওসিয়ত বৈধ নয়।[১১৬]

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়ত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোষ গ্রহণের) সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা যাবে না। হ্যাঁ, তারা নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।"

উক্ত আয়াতে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে এক বছর ইদ্দত পালন করতে বলা হয়েছে। অথচ এই হুকুমকে রহিত করে পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে'।[১১৭]

---

১১৬. মুসনাদে আহমাদ; হাদীস: ১৭৬৬৬

১১৭. সূরা বাকারা; আয়াত ২৩৪,

স্মর্তব্য, আমাদের দেশে তালাক প্রদানের ভুল পদ্ধতি চালু আছে। স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় কোন ধরণের চিন্তা-ফিকির ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে মুফতি সাহেবের নিকট ফাতওয়া চায়। সঠিক পদ্ধতি হল, সমস্যার সম্মুখীন হলে তালাক দেয়ার পূর্বে ফাতওয়া নিবে। কয়েক ধাপ অতিক্রম করার পর শেষ ধাপে তালাক দেয়ার অনুমতি আছে। মুসলিম পারিবারিক আইন নামে কোর্ট-কাচারিতে এক অদ্ভুত আইন প্রনয়ন করা হয়েছে যে,স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে নব্বই দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সাহেব সমোঝতা করতে পারলে তালাক হবে না। চেয়ারম্যান সাহেব ব্যর্থ হলে তিন মাস পরে তালাক কার্যকর হবে। শর'ঈ ইলম থাকলে আইন প্রনয়নকারীগণ আইন জারী করত যে, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর উপর অতিষ্ঠ হয়ে তালাক দিতে চাইলে প্রথমে চেয়ারম্যান সাহেবের শরণাপন্ন হবে। তিন মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান সাহেব সমোঝতা করতে না পারলে স্বামীর তালাক দেয়ার অধিকার থাকবে।

হাদীস শরীফের ন্যায় কুরআন পাকের আয়াতসমূহও অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজানো হয়নি। অতএব শুধু কুরআনের অনুবাদ পড়ে আমল করা নিশ্চিত গোমরাহী।

তৃতীয় আয়াত: প্রথমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রোযার বিধান এসেছে শিথিলভাবে। যাদের সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহরী খেয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা এবং গুনাহ বর্জনের হিম্মত হয় তারা রোযা রাখবে। হিম্মত না হলে না রাখারও সুযোগ ছিলো। প্রতি রোযার বদলে একজন ফকীরকে দুবেলা খাওয়ালে বা এর মূল্য দিয়ে দিলে রোযা আদায় হয়ে যেতো।

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: যারা রোযা রাখার সামর্থ রাখে, তারা একজন মিসকিনকে খানা খাইয়ে (রোযার) ফিদয়া আদায় করতে পারবে।[১১৮]

রোযার এ প্রাথমিক বিধানের সময় অনেকেই রমাযানে হিম্মত করে রোযা রাখতেন আর কোন কোন সাহাবী ফকীরকে দু'বেলা খাওয়াতেন। তবে তারাও নিজেদের পিতা মাতা, ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের রোযা রাখা দেখে বুঝতে পারলেন যে, সারাদিন খানা পিনা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে রোযা রাখা সম্ভব, এবং আগামীতে রোযা রাখার নিয়ত করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: এখন থেকে তোমাদের মধ্যে সামর্থ্যবান ব্যক্তি রমাযান মাস পেলে অবশ্যই রোযা রাখবে।[১১৯]

সামর্থ্যবানদের রোযা না রেখে ফকীরকে খানা খাওয়ানোর বিধান রহিত হয়ে গেলো। এ হুকুম শুধুমাত্র অতিশয় বৃদ্ধ, মুমূর্ষু রোগীদের জন্য বহাল থাকলো। তারা প্রতিটি রোযার বদলে একজন ফকীরকে দু'বেলা খানা খাওয়াবে বা একটি সদকায়ে ফিত্‌র পরিমাণ মূল্য দিয়ে দিবে।[১২০]

হাদীসের বর্ণনাসমূহের তরজমা পড়ে আমল করাও বৈধ নয়

---

১১৮. সূরা বাকারা; আয়াত ১৮৪
১১৯. সূরা বাকারা; আয়াত ১৪৫
১২০. হাশিয়ায়ে তাহতাবী ১/৪৮০

দৃষ্টান্ত এক : নামায প্রসঙ্গ

মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে কয়েকটি জিনিস হাদিয়া দিলেন। **প্রথম হাদিয়া :** শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে কবরে আসার ওপর জান্নাতের ওয়াদা।[১২১] আল্লাহ তা'আলার নিকট শিরকযুক্ত ঈমানের কোন মূল্য নেই। শিরকের উদাহরণ হলো, মাযারে প্রার্থনা করা, সিজদা করা, মাযার তাওয়াফ করা ইত্যাদি। মাযার কেন্দ্রিক যা কিছু হয় প্রত্যেকটা ঈমান বিধ্বংসী।[১২২]

বর্তমানে এনজিও, খ্রিস্টান মিশনারীগুলো অনেক ভালো ভালো কাজ করছে, বাড়ি বাড়ি টয়লেট বানিয়ে দিচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল বানিয়ে দিচ্ছে, টিউবওয়েল বসিয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি। এসবের কোন বিনিময় তারা আল্লাহর কাছে পাবে না। কেননা, তাদের ঈমান নেই। ইয়াহুদী ধর্ম খ্রিস্টধর্ম এক সময় ঠিক ছিলো। কিন্তু কালপরিক্রমায় তা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেছে। উপরন্তু কুরআন নাযিল হওয়ার পর সব রহিত হয়ে গেছে। মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম– কুরআন ও প্রিয় নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।[১২৩]

---

১২১. সহীহ বুখারী; হাদীস ১২৩৭

১২২. উল্লেখ্য, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকারসহ বিভিন্ন আমল করে সওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে মাযারে যাওয়া শরীয়ত অনুমোদিত। কিন্তু মাযার থেকে কিছু আনার নিয়তে গেলে ঈমান নিয়ে ফিরে আসা যাবে না, দাফন করে আসতে হবে। মাযারওয়ালা তো দূরের কথা, নবী রাসূল পর্যন্ত কোন কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না।

১২৩. আমাদের সমাজে অনেক ভাই এমন আছে যারা কোন দিন মাদরাসায় পড়েনি, উলামায়ে কেরামের মজলিসে যায়নি, দা'ওয়াত ও তাবলীগেও সময় লাগায়নি। চোখ, কান ফোটার সাথে সাথে বাপ মা ইংলিশ মিডিয়াম, সেন্ট যোসেফ বা সেন্ট পোল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলো। কখনো দ্বীন শেখার সুযোগ করে দেয়নি, সেও নিজ আগ্রহে শেখেনি। এধরণের লোকেরা সব ধর্মকে সঠিক মনে করে। মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ যে ধর্মালম্বীই হোক না কেন ভালো কাজ করলে বেহেশতে যাবে খারাপ কাজ করলে দোযখে যাবে এই হলো তাদের বিশ্বাস। তারা বলে মানব সেবা সবচে বড় ধর্ম। মানব সেবা নামে কোন ধর্ম আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি।

আর বর্তমানে কাফেরদের জাগতিক যে উন্নতি-অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তা মূলত মুসলমানদের থেকেই ধার করা। ইসলামের নীতিঅনুসরণের কারণেই আজ কাফেররা ব্যবসার ময়দানে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক উপরে। ব্যক্তিজীবনে তারা মদখোর, ব্যভিচারী হলেও

মি'রাজের দ্বিতীয় হাদিয়াঃ নামায। নামায প্রথমে দুই ওয়াক্ত ছিলো। মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত করে দিলেন। ফেরার পথে হযরত মূসা আ. এর অনুরোধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরিয়াদ করায় আল্লাহ তা'আলা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন, আপনার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যদিও আমি পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছি কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে আপনার উম্মতকে পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সওয়াব দান করবো। আমার পবিত্র কালাম কখনো পরিবর্তন হয় না। مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ।[১২৪]

মি'রাজের দ্বিতীয় হাদিয়া নামাযের এ বিধান ধাপে ধাপে পূর্ণ হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান-প্রাথমিক সময়ে জায়েয ছিলো- পরবর্তীতে তা নাজায়েয করে দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ

- এক সময় নামাযে কথা বলা জায়েয ছিলো। একবারের ঘটনা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামচার রাক'আত বিশিষ্ট নামায দুই রাক'আত পড়িয়ে সালাম ফেরালেন। এবং সামনে বেড়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসলেন। জামা'আতে হযরত আবু বকর রাযি. উমর রাযি. এর মত বড়

ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছে দুনিয়াকে জয় করার জন্য।

যেমন ১: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আদর্শ হল, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাদের খোঁজ খবর রাখা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর রাযি. হযরত উমর রাযি. রাতের আঁধারে জনসাধারণের খবর নিতে যেতেন। অমুসলিমরা এ নীতি গ্রহণ করে আজ বিশ্বের গরীব মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে।

২: কাফেররা আজ অনেকগুলো রাষ্ট্র মিলে একটি শক্তি বানিয়েছে। এই পদ্ধতিও তারা মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর আট-দশটি এলাকা সংযুক্ত করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রদেশ বানিয়ে দিতেন। একজন মুফতীকে গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। মানুষেরা গভর্ণরের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করে করে আমল করত। মাযহাবের সূচনা তখন থেকেই। প্রত্যেক প্রদেশে গভর্ণর ভিন্ন হওয়ায় ফাতওয়াও ভিন্ন ভিন্ন হত। প্রত্যেকে নিজ নিজ ইল্‌ম অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। সব ফাতওয়ায় ঠিক ছিল। সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কারো ফাতওয়া ভুল সাব্যস্ত করতেন না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৩৫২)

১২৪. সূরা কাফ; আয়াত ২৯

বড় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ভয়ে কারো কিছু বলার সাহস হলো না। যে যত বেশি বড়দের নিকটবর্তী হয় সে তত বেশি ভয় পায় যাতে কোন ধরণের বেয়াদবী না হয়ে যায়। মজলিসে একজন সাহাবী ছিলেন। দাঁড়ালে হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছুত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতাকে যূলইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি সাহস করে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি আল্লাহর পক্ষ থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে না কি আপনি ভুলে গেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, كل ذلك لم يكن দু'টির কোনটিই হয়নি। আল্লাহ তা'আলাও কমাননি, আমার জানা মতে আমিও ভুল করিনি। যূলইদাইন রাযি. বললেন, কিছু না কিছু অবশ্যই হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঘটনা যাচাইয়ের জন্য হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলে তারা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায দুই রাক'আত পড়ানো হয়েছে। এসব কথা বার্তার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুই রাক'আত পড়িয়ে সাহু সিজদা করলেন।[১২৫]

এই হাদীস দেখে যদি বর্তমানে কোন ইমাম সাহেব দুই রাক'আত পড়িয়ে কথাবার্তার পর বাকী দুই রাক'আত পড়ে সাহু সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অথচ ইমাম সাহেব বাহ্যিকভাবে বুখারী শরীফের ওপর আমল করেছেন। বোঝা গেল কুরআন শরীফে থাকলেই কিংবা বুখারী শরীফে থাকলেই আমল করা যাবে না। দেখতে হবে এব্যাপারে একটিই হাদীস বর্ণিত হয়েছে নাকি একাধিক হাদীস। একাধিক হাদীস থাকলে প্রথম হাদীসটি রহিত। শুধু শেষ হাদীসটি আমলযোগ্য। হাদীসের বিশাল ভান্ডারে রহিত হাদীসগুলোও লিপিবদ্ধ আছে। বিষয়টি না জানার কারণে অনেকে বুখারী শরীফে পেলেই আমল শুরু করে দেয়।

- মদীনায় হিজরতের পূর্ববর্তী সময়ে নামাযে রফয়ে' ইয়াদাইন করার (বার বার হাত তোলার) অনুমতি ছিলো। কারণ ৩৬০ খোদার কথা মনে হত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএসব চিন্তা দূর করার জন্য বার বার হাত তোলার পদ্ধতি শেখালেন। ঈমান মজবুত হয়ে যাওয়ার পর নিষেধ করে দিলেন। রফয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় হাদীসের

---

১২৫. সহীহ বুখারী; হাদীস ৭১৪

বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.। মক্কায় রফয়ে ইদাইন করার এবং মদীনায় না করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর একাধিক শাগরেদ বর্ণনা করেন, আমাদের উস্তাদ অব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নামাযের শুরুতে একবার ব্যতীত আর কোন স্থানে হাত ওঠাতেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে যবানী এবং আমলী উভয় বর্ণনা দ্বারা রফয়ে ইদাইন না করা প্রমাণিত। রফয়ে ইয়াদাইন এক সময় জায়েয থাকলেও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।[১২৬]

- এক যামানায় ইমাম বসে নামায পড়ালে মুক্তাদির জন্যও বসে ইক্তিদা করার হুকুম ছিলো। উযর থাক বা না থাক। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন ইমাম উযরের কারণে বসে নামায পড়ালে মুক্তাদি বিনা উযরে বসে ইক্তিদা করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।
  নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুধবার থেকে সোমবার পর্যন্ত অসুস্থ থাকার পর ১লা রবিউল আউয়ালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের বছর ১২ই রবিউল আউয়াল কোনভাবেই সোমবার পড়ে না। সমাজে ভুলটাই বেশি প্রসিদ্ধ। এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের সময় মসজিদে তাশরীফ এনে বসে নামায পড়ালেন। আওয়ায এত ক্ষীণ ছিলো যে, হযরত আবু বকর রাযি. কে মুকাব্বির বানিয়ে নিজের সাথে দাঁড় করালেন। বাকী সাহাবীরা পিছনে দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করলেন। এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত দুই: মদ নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা মদকে কয়েক ধাপে নিষেধ করেছেন। প্রথমে মদের ক্ষতির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে আসতে নিষেধ করেছেন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায পড়লে কেরাআতে ভুল হতে পারে। এভাবে কয়েক ধাপের পর এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

১২৬. সুনানে নাসায়ী; হাদীস ৬৪৯, সুনানে বাইহাক্বী; হাদীস ৩৫২১

অর্থ: হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মুর্তি এবং লটারির তীর, এসব গর্হিত বিষয় শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই না; সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১২৭]

প্রথমদিনই মদ নিষিদ্ধ করলে আমল করা কষ্টকর হত। এই জন্য দিল তৈরি করার পর আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করলেন। তখন আমল করতে বিন্দুমাত্রও দেরি হয়নি।

এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে মদীনার অলিতে গলিতে আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আয়াত শোনার সাথে সাথে যারা মদ পান করছিলো গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেললো। যাদের ঘরে মদ ছিলো তারা পাত্র ভেঙ্গে ফেললো। ব্যবসায়ীরা মদের মশকগুলো (চামড়ার পাত্র যেগুলোতে মদ ছিলো) চাকু দিয়ে ফেড়ে দিলো। ফলে রাস্তা ঘাট মদের বন্যায় ভেসে গেলো। দিল তৈরি হওয়ার কারণে এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রথমে উম্মতের দিল তৈরি করেছেন। তখন উম্মতের নামায-রোযা সহ অন্যান্য সকল আমল ঠিক হয়ে গেছে।[১২৮]

হাদীসের কিতাবাদিতে সাহাবায়ে কেরামের মদ পান করার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে বর্ণনাগুলো কেবল হাদীস, সুন্নাত তথা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়; বরং আমলযোগ্য হলো এ ব্যাপারে সর্বশেষ হুকুম তথা মদ হারাম।

সারকথা, কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলী তেইশ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে এভাবেই ধাপে ধাপে পূর্ণতা লাভ করেছে। সর্বশেষ বিদায় হজ্জে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে এবং তোমাদের ওপর আমার নে'আমতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর আমি একমাত্র ইসলামের ওপর রাযি হয়ে গেলাম।[১২৯]

---

১২৭. সূরা মাইদাহ; আয়াত ৯০
১২৮.সুনানে বাইহাক্বী; হাদীস ১১৫৫২

এখন উম্মতের জন্য আমলযোগ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর সর্বশেষ হুকুম তথা সুন্নাত। আর কুরআন-হাদীসের যে সকল বিষয় কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো, অর্থাৎ যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, সে সকল বিধানাবলী সুন্নাত তথা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়। রহিত হয়ে যাওয়া সে বিধানাবলী কুরআন হাদীস থেকে পাঠ করলে সওয়াব হবে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করলে সওয়াবের পরিবর্তে মারাত্মক গুনাহ হবে।

একটি যুক্তিনির্ভর উদাহরণ

ডাক্তার রোগীর অবস্থাভেদে প্রথমবার এক ঔষধ, দ্বিতীয়বার ভিন্ন ঔষধ, তৃতীয়বার পরিবর্তন করে নতুন ঔষধ লেখে। প্রথম দুই প্রকারের ঔষধ ভুল ছিলো না। তখন সেটাই ঠিক ছিলো। কিন্তু তৃতীয়বার প্রেসক্রিপসনের পরও রোগী পূর্বের ঔষধ খেতে থাকলে সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতাই বাড়তে থাকবে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবস্থার পরিপেক্ষিতে সময়ে সময়ে হুকুম আহকাম পরিবর্তন করেছেন। শেষ হুকুম নাযিল হওয়ার পরও কোন ব্যক্তি পূর্বের হুকুম মানতে থাকলে তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোটকথা দ্বীনের বিধি-বিধানগুলো ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত হয়েছে। সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত হুকুমকে সুন্নাত বলা হয়। এ ধরণের সুন্নাতই আমলযোগ্য। আর শুরু যামানার রহিত হুকুমগুলোকে শুধুই হাদীস বলা হয়। সুন্নাত বলা হয় না। বর্তমানে এসকল হাদীসের উপর আমল করা নাজায়েয। হাদীসের কিতাবসমূহে নবুওয়াতের তেইশ বছরের সকল আমলই উল্লেখ করা হয়েছে। অমুক আমলের ব্যাপারে এটি প্রথম, এটি শেষ এভাবে সুবিন্যস্ত করে হাদীস ও সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য হাদীসের কিতাবাদিতে করা হয়নি। কাজেই সাধারণ পাঠকদের জন্য 'হুকুম-আহকাম' সম্বলিত হাদীসের গ্রন্থাবলী যেমন: বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি পাঠ করা উচিত নয়; বরং তাদের উচিত 'ফাযায়েল সম্বলিত' হাদীসের গ্রন্থাবলী যেমন ফাযায়েলে আমল ইত্যাদি পাঠ করা, আর আমলের ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখা। এর বিপরীতে তারা যদি হক্কানী উলামায়ে কেরামের উপর আস্থা হারিয়ে আমলের জন্য হাদীসের কিতাবাদির অনুবাদের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন, তবে এর দ্বারা তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হবেন, তেমনি সমাজের মধ্যেও গোমরাহী আর ভ্রষ্টতার সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হবেন।

---

১২৯. সূরা মাইদাহ; আয়াত ৩

বর্তমানের আহলে হাদীস ভাইদের অবস্থা

আমাদের কিছু ভাই কেবল বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফের বাংলা অনুবাদ দেখে আমল করে। তাদের 'ইসলাম রিসার্চ' কেবল অনুবাদ নির্ভর হওয়ায় তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হয়, তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ করে। শুধু তাই নয়; কিছু ভাই তো 'অল্প বিদ্য ভয়ঙ্কর' এ প্রবাদ ভুলে গিয়ে মসজিদে এসে রীতিমত ইমাম সাহেবানদের সাথে তর্ক জুড়ে দিতেও কুণ্ঠিত হন না। এটা যে, কত বড় অনাধিকার চর্চা, তা তারা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না। এ ভাইদের মধ্যে যাদেরকে কিছুটা 'ইলমধারী' মনে করা হয়, তারা হাদীসের অপব্যাখ্যা করতে ঠিক ততটা পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তাদের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার একটি দৃষ্টান্ত হলো, হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা কাতারে দাঁড়ানোর সময় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে'। মিলানোর অর্থ হলো কাতার সোজা রাখা, পা আগে পিছে না করা। আহলে হাদীস ভাইয়েরা অর্থ করে, একজনের পা অন্যের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীসে আছে, 'তোমরা নামাযের কাতারে দু'জনের পায়ের মাঝে জুতা রাখবে না। সেখানে ফেরেশতারা দাঁড়ায়'।[১৩০] আহলে হাদীস ভাইদের ব্যাখ্যা মানা হলে দু'জনের মাঝে জুতা রাখার জায়গাও থাকে না, কাতারে ফেরেশতাদের দাঁড়ানোর ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদও ঠিক থাকে না। মূলত তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে।

অধিকাংশ আহলে হাদীস ভাই আরবী বুখারী শরীফ দেখেইনি; অনুবাদই তাদের সম্বল। নাসেখ মানসূখের (হাদীস রহিত হওয়া-বহাল থাকার) বিষয়টি হয়ত কখনো শোনেইনি। তাদের ধারণা অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র তারাই সহীহ হাদীসের উপর আমলকারী। এগুলো ইংরেজদের তৈরি ফিতনা। শুরুতে গাইরে মুকাল্লিদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ইংরেজ গভর্নরের নিকট আবেদন করে 'আহলে হাদীস' নাম মঞ্জুর করেছিলো। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ফাতওয়া দিয়েছিলো, 'ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজ সরকার খোদার রহমত এবং এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম'। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 'মাযহাব ও তাকলীদ' নামক বইয়ে আমি লিখেছি।

---

১৩০. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৬৫৪

সারকথা, কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার পদ্ধতি হলো, 'সুন্নাহ' তথা সর্বশেষ নাযিলকৃত হুকুমের উপর আমল করা। এ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কেবল অনুবাদ নির্ভর জ্ঞান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন এবং সহীহ সুন্নাতের ওপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

ইবাদাত

দু'আ ও মুনাজাত : কিছু শর্ত ও আদব

মুমিন বান্দা তার সকল কাজ সম্পাদনে, নিজের সকল প্রয়োজনে কেবল আল্লাহর তা'আলার দরবারেই প্রার্থনা করে। এতে অন্য কারো মধ্যস্থতা সে গ্রহণ করে না। কেননা মানুষের সকল প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার কাছে রোনাজারি ও দু'আর মাধ্যমেই পুরা হয়। এতে কারো মধ্যস্থতার দরকার হয় না। এছাড়া হাদীসে এসেছে দু'আ হলো একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। অন্য হাদীসে এসেছে দু'আ ইবাদতের মগজ। তাই দু'আর মাধ্যমে মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়ার সাথে সাথে এতে রয়েছে বিশেষ ইবাদতের সওয়াব। প্রত্যেক দু'আর বিনিময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা সওয়াব লাভ হয়।

দু'আর এই ফযীলত ও ফায়দা লাভ করতে হলে বেশ কিছু শর্ত ও আদব রক্ষা করা জরুরী। সে সব শর্ত ও আদবের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় এবং দু'আর দ্বারা পূর্ণ সুফল লাভ হয়। কিছু শর্ত ও আদব নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

দু'আ কবুল হওয়ার কিছু শর্ত

১. দু'আকারীর পানাহার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান হালাল হওয়া। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অনেক মানুষ দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো চুল ও ধূসর দেহ নিয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে বলতে থাকে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই হারাম। অতএব তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে?'[১৩১]

২. বাহ্যিকভাবে কবুল হতে বিলম্ব হচ্ছে মনে হলে অধৈর্য্য না হওয়া– একথা না বলা যে, আমি দু'আ করেছিলাম কিন্তু তা কবুল হয়নি। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের দু'আ কবুল হবে যদি তোমরা তাড়াহুড়া না করো এবং একথা না বলো যে, আমি দু'আ করলাম কিন্তু তা কবুল হলো না।'[১৩২]

---

১৩১. সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০১৫
১৩২. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭৩৫

৩. প্রার্থিত বিষয় নাজায়েয কিছু না হওয়া। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোনো মুসলমান যখন কোনো দু‘আ করে তখন যদি সে কোনো গুনাহের জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু‘আ না করে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে হয়ত তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দান করেন অথবা তার থেকে অনুরূপ অনিষ্টতা দূর করে দেন।’[১৩৩]

৪. দু‘আ কবুল হওয়ার জন্য এও শর্ত যে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ বিদ্যমান থাকা। কেননা ব্যাপকভাবে এ আমল বন্ধ হয়ে গেলে দু‘আ কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকে না। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘হে লোক সকল! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে বলেছেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এমন সময় আসার পূর্বে, যখন তোমরা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো না। তোমরা আমার নিকট কিছু চাইবে কিন্তু আমি তা পূর্ণ করবো না। তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না।’[১৩৪]

দু‘আর আদবসমূহ

১. উযুর সাথে মুনাজাত করা।[১৩৫]

২. কিবলামুখী হয়ে মুনাজাত করা।[১৩৬]

৩. মুনাজাতের সময় সিনা বরাবর হাত তোলা এবং মুনাজাত শেষে চেহারায় হাত মোছা।[১৩৭]

৪. দু‘আর পূর্বে কোনো নেক আমল করা।[১৩৮]

৫. আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও খুব কাকুতি-মিনতি করে এভাবে দু‘আ করা যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দিয়েই দাও, আমার তো আর কোনো রব নেই, তুমি কবুল না করলে

---

১৩৩. জামে’ তিরমিযী; হাদীস ৩৪৬৮, মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১১১৩৩
১৩৪. সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ২৯০
১৩৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৪৯৮
১৩৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৯৬০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৯৪
১৩৭. মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১১০৯৩, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৪৮৫
১৩৮. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭৪৩

আমার কোনো উপায় নেই। এভাবে বিনয়ের সাথে বারবার বলতে থাকা।[১৩৯]

৬. দু'আর শুরুতে ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা ও নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করা এবং 'আমীন' দ্বারা দু'আ শেষ করা।[১৪০]

৭. এই ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সাথে মুনাজাত করা যে, আমি যা চাইলাম আমার মওলা নিশ্চয় আমাকে তা দিবেন।[১৪১]

৮. নিম্নস্বরে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে কায়মনোবাক্যে ও অনুচ্চস্বরে ডাকো, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'[১৪২]

৯. মুনাজাতে কান্নাকাটি করা। কান্না না এলে কান্নার ভান করা।[১৪৩]

১০. সকল মুমিনের জন্য দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আপনি আপনার নিজের ভুলের জন্য ইস্তিগফার করুন এবং সকল মুমিন নর-নারীদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'[১৪৪] নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রত্যেক নর-নারীর বদলায় তার আমলনামায় একটি করে নেকী লেখা হয়।[১৪৫]

১১. প্রথমে নিজেকে দিয়ে দু'আ শুরু করা। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো আলোচনা করে তার জন্য দু'আ করতে চাইতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন, এরপর আলোচিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতেন।[১৪৬]

---

১৩৯. সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৮৭১
১৪০. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৪৮১, জামে' তিরমিযী; হাদীস ৩৪৭৬
১৪১. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩৩৯, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬৭৮
১৪২. সূরা আল আ'রাফ; আয়াত ৫৫
১৪৩. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২০২, ইবনে মাজাহ; হাদীস ৪১৯৬
১৪৪. সূরা মুহাম্মদ; আয়াত ১৯
১৪৫. ত্ববারানী; মুসনাদুশ শামিয়্যীন; হাদীস ২১৫৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২১০
১৪৬. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৯৮৪, জামে' তিরমিযী; হাদীস ৩৩৮৫

১২. কোনো গুনাহের কাজ সম্পন্ন হওয়ার দু'আ না করা। নাজায়েয কোনো কিছুর জন্য দু'আ না করা। এসব দু'আ তো কবুল হয়ই না বরং ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।[১৪৭]

দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু সময়

১. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর।[১৪৮]

বি.দ্র. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। তবে এই মুনাজাত নামাযের অংশ নয় এবং এখানে ইমামের ইত্তিবা' বা অনুসরণ নেই। সুতরাং যারা বলে, ফরয নামাযের পর মুনাজাত করা আবশ্যক তাদের কথা যেমন সহীহ নয় তেমনি যারা দাবি করেন যে, ফরয নামাযের পর কোনো মুনাজাতই নেই তাদের কথাও সহীহ নয়। বিস্তারিত জানতে এ বিষয়ে আমার লেখা *'ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের শর'ঈ বিধান'* কিতাবটি পড়ে নিতে পারেন।

২. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে।[১৪৯]

৩. রাতের শেষভাগে।[১৫০]

৪. জুমু'আর দিন খুতবার মাঝে কিংবা আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।[১৫১]

৫. যমযমের পানি পান করার সময়ে।[১৫২]

৬. শরী'আত সম্মত যিকিরের মজলিসে থাকা অবস্থায়।[১৫৩]

৭. সিজদা অবস্থায়। মুমিন বান্দা এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটে চলে যায়।[১৫৪]

৮. অসুস্থ ব্যক্তির নিকট দু'আ করার সময়। কারণ তার নিকটে গিয়ে যা বলা হয় এর উপর ফেরেশতারা 'আমীন' বলতে থাকে।[১৫৫]

---

১৪৭. জামে' তিরমিযী; হাদীস ৩৫৬৮, মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১১১৩৩
১৪৮. জামে' তিরমিযী; হাদীস ৩৪৯৪
১৪৯. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫২১, জামে' তিরমিযী; হাদীস ২১২
১৫০. জামে' তিরমিযী; হাদীস ৩৪৯৯
১৫১. সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৩৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫২
১৫২. মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৪৮৪৯, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩০৬২
১৫৩. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৪০৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭২৯
১৫৪. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৮২

৯. বৃষ্টির সময়।[১৫৬]
১০. জিহাদের ময়দানে যুদ্ধরত অবস্থায়।[১৫৭]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'আর শর্ত ও আদাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে দু'আ কবূলের বিশেষ মুহূর্তগুলো সহ সব সময় বেশি বেশি দু'আ করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

মীলাদ কিয়াম, সহীহ মীলাদ, ঈদে মীলাদুন্নবী ও জশনে জুলুস প্রসঙ্গ

ইসলামী শরী'আতে মনগড়া ইবাদতের বৈধতা নেই। ইবাদতের মৌলিক বুনিয়াদ হলো– কুরআন এবং সুন্নাহ। এর বাইরে ইবাদতের নামে কোন কিছু করলে সেটা হবে বিদ'আত ও গোমরাহী। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে।'[১৫৮]

মীলাদ প্রসঙ্গ

মীলাদ এর আভিধানিক অর্থ জন্ম, জন্মকাল ও জন্ম তারিখ। পরিভাষায় মীলাদ বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা বা জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মজলিসকে।

তবে আমাদের দেশে প্রচলিত মীলাদ বলতে বোঝায় ঐ সব অনুষ্ঠানকে, যেখানে মওজু' রেওয়ায়েত সম্বলিত তাওয়ালূদ পাঠ করা হয় এবং অনেক স্থানে দুরূদ পাঠ করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে হাযির-নাযির হয়ে যান–এই বিশ্বাসে কিয়ামও করা হয়। এসব করা হলেই মূলত সেটাকে মীলাদ মাহফিল মনে করা হয়, চাই তাতে রাসূলের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা হোক বা না হোক। তাওয়ালূদ, সমস্বরে ভুল দুরূদ

---

১৫৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯১৯
১৫৬. মুস্তাদরাকে হাকেম: ২/১১৪
১৫৭. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৫৪০, সুনানে দারেমী; হাদীস ১২০০
১৫৮. সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৫৭৮

তথা ইয়া নবী সালা-মালাইকা... এবং কিয়াম করা না হলে সেটাকে মীলাদই মনে করা হয় না।

মীলাদের হুকুম

মীলাদ বলতে যদি এই অর্থ হয় যে, রাসূলের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা, তাহলে নিঃসন্দেহে তা কল্যাণ ও বরকতের বিষয়। কিন্তু যদি প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য হয়, যা উপরে উল্লেখ করা হলো, তাহলে তা কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিদ‘আত ও গোমরাহী।

কেননা শরী‘আতের ভিত্তি যে চারটি বিষয়ের উপর তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস, এই চারটির কোনটি দ্বারা মীলাদ প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন এবং যাদের যুগকে সর্বোত্তম যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং যাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের কারো থেকে এজাতীয় মীলাদ প্রমাণিত নেই এবং তাদের কারো যুগেই এর অস্তিত্ব ছিলো না। এমনকি চার মাযহাবের ইমামগণের কারো যুগেও এর হদিস ছিলো না। এক কথায় রাসূলের যমানা থেকে দীর্ঘ ছয়শত (৬০০) বছর পর্যন্ত এর কোন অস্তিত্ব ছিলো না। বরং ৬০৪ হিজরীতে তার সূচনা হয়।

কিয়াম প্রসঙ্গ

কিয়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। আর মু‘আশারা তথা সামাজিকতায় কিয়াম বলতে বোঝায় কারো আগমনে দাঁড়ানো। আর মীলাদের ক্ষেত্রে কিয়াম বলতে বোঝায় কোন মজলিসে সমস্বরে দুরূদ পাঠ করার পর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মজলিসে হাযির হয়ে গেছেন– এই ধারণায় ইয়া নবী বলতে বলতে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরূদ পাঠ করা।

মীলাদের মধ্যে কিয়ামের হুকুম

এক. যখন উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত মীলাদ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং আমল কোনটি দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং খাইরুল কুরূনে এর কোন অস্তিত্ব ছিলো না, তখন কিয়াম বৈধ হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

উপরন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় নিজের জন্য কিয়াম করাকে অপছন্দ করতেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর প্রতি অপরিসীম মহব্বত ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন স্বশরীরে উপস্থিত হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়েও তারা দাঁড়াতেন না। সুতরাং যেখানে তিনি নিজেই তাঁর সম্মানে দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন, সেখানে তার অপছন্দনীয় বস্তুকেই তাঁর জন্য সম্মানের বিষয় নির্ধারণ করা, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ বা রাসূলের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাস করা ছাড়া আর কি হতে পারে! আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

দুই. হাদীস শরীফে আছে- হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে আমি তা সরাসরি শুনি, আর যে দূর থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে।[১৫৯]

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন, যারা গোটা পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকেন, এবং উম্মতের সালাম আমার কাছে পেশ করেন।[১৬০]

সুতরাং তাদের কথা অনুযায়ী যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদের মজলিসে সশরীরে হাযির হন, তাহলে উল্লিখিত হাদীসের কী অর্থ থাকে, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরেশতা দ্বারা দুরূদ পৌঁছানো হয়। মূলত এটা চরম অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই না।

তিন. কুরআন এবং হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, রাসূল হাযির-নাযির নন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হাযির-নাযির বা সর্বত্র বিরাজমান। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- *তোহফায়ে আহলে বিদ'আত, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ।*

প্রচলিত মীলাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরামের উক্তি

---

১৫৯. শুআবুল ঈমান; হাদীস ১৫৮৩
১৬০. সুনানে দারেমী; হাদীস ২৭৭৪

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন, প্রচলিত মীলাদ কুরআন সুন্নাহর কোথাও নেই এবং পূর্ববর্তী উম্মতের আদর্শ কোন ব্যক্তি থেকেও প্রমাণিত নয়। বরং তা সুস্পষ্ট বিদ'আত, যার আবিষ্কারক হলো একদল পেটপূজারী।[১৬১]

হাফেয সাখাবী রহ. তার ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এ জাতীয় মীলাদ সর্বোত্তম তিন যুগের সালাফে সালিহীনের কারো থেকে সাব্যস্ত নেই। বরং এর পরবর্তী যুগে সূচনা হয়েছে।[১৬২]

আল্লামা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী রহ. বলেন, চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এজাতীয় প্রচলিত মীলাদ নিন্দনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১৬৩]

সহীহ ও বৈধ মীলাদ

মীলাদের অর্থ হলো জন্ম। মীলাদ মাহফিলের উদ্দেশ্য হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হয়েছে এবং তিনি নবুয়তের ২৩ বছরে উম্মতের জন্য যেসব সুন্নাত রেখে গেছেন, তার কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, এবং আলোচনা শেষে শ্রোতাগণ নিজস্ব ভাবে হাদীসে বর্ণিত সহীহ দুরূদ ৩ বার বা ১১ বার পড়ে নেয়া, তারপর সকলে মিলে দু'আ মুনাজাত করা। এ হলো সহীহ মীলাদের রূপরেখা। এর মধ্যে কোন গুনাহ নেই, বরং এটা বরকতময় মাহফিল।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশনে জুলুস প্রসঙ্গ

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ এলে সমাজের এক শ্রেণীর লোক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালনের নামে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর ব্যাপক উৎসব ও আনন্দমুখর আয়োজন করে থাকে।

একে কেন্দ্র করে দেয়াল লিখন, ব্যানার বানানো, সভা-সমাবেশ, গেইট সাজানো, রাসূলের শানে কাসিদা পাঠ, নকল বাইতুল্লাহ ও রওযা শরীফের প্রতিকৃতি নিয়ে রাস্তায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত শোভাযাত্রা, ঢোল-তবলা, গান-বাজনা এবং নারী-পুরুষের উদ্দাম নাচানাচি ও অবাধ ঢলাঢলি ইত্যাদি।

---

১৬১. আল-হাবী লিল ফাতওয়া: ১/২২২-২২৩
১৬২. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১/৩৬২
১৬৩. আল ক্বওলুল মু'তামাদ; পৃষ্ঠা: ১৬২

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

অবশেষে মিষ্টি ও তবারক বিতরণ করা হয়ে থাকে এবং এটাকে মহাপূণ্যের কাজ ও শ্রেষ্ঠ ঈদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম

এক. ইসলামে কোন মহা-মনীষীর জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই। যদি থাকতো তাহলে বছরের প্রত্যেক দিনই জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করতে হতো। কেননা লক্ষাধিক নবী-রাসূল ও লক্ষাধিক সাহাবা এবং শত সহস্র ওলী-বুযুর্গ দুনিয়াতে আগমন করে বিদায় নিয়ে গেছেন। আর তালাশ করলে দেখা যাবে, বছরের প্রত্যেক দিন কোন না কোন নবী কিংবা সাহাবা অথবা কোন বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা ইন্তিকাল করেছেন। ফলে সারা জীবন কেবল জন্ম দিবস আর মৃত্যুদিবস পালনের মাঝেই কেটে যাবে। ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ হবে না। কখনো দেখা যাবে একই দিনে কোন মহামনীষী জন্ম গ্রহণ করেছেন আবার কোন মনীষী ইন্তিকাল করেছেন। তখন একই দিন জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করতে হবে। যার পরিণতিতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও মারামারি দেখা দিবে। অথচ ইসলাম মানুষকে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা শেখায়।

দুই. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। রাসূলের ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ১১০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াতে ছিলেন। এই সূদীর্ঘ কালের প্রতি বছরই রবিউল আউয়াল মাস আসতো, কিন্তু কোন বছরই না রাসূল স্বয়ং নিজের জন্মদিন পালন করেছেন এবং না কোন সাহাবা করেছেন।

তিন. জাহেলী যুগে মদীনাবাসীরা (প্রথা অনুযায়ী) দু'টি দিনে আনন্দ উৎসব করতো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (আনন্দের) জন্য এ দু'টি দিনের চেয়ে উত্তম দু'টি দিন তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[১৬৪]

এর দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান কখনো নিজেরা নিজেদের ঈদ নির্ধারণ করতে পারে না। বরং তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলমানদের ঈদ হলো দু'টি,

---

১৬৪. সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৫৫৬

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সুতরাং তৃতীয় কোন দিনকে ঈদ হিসাবে নির্ধারণ করা হলে সেটা হবে স্পষ্ট বিদ'আত ও গোমরাহী। কুরআন-সুন্নাহর সাথে যার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে' তাবেঈনের তিন সোনালী যুগে ঈদে মীলাদুন্নবীর কোন অস্তিত্ব ছিলো না। কুরআন-সুন্নাহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের আলোচনায় দুই ঈদের অধ্যায় আছে এবং মাসাইলের আলোচনা আছে, কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী নামে না কোন অধ্যায় আছে, না তার ফাযাইল ও মাসাইলের আলোচনা আছে।

এ ঈদ যেমন মনগড়া, তা পালনের রীতিও মনগড়া। এ ক্ষেত্রে যে সকল ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়, সেগুলোও জাল এবং বানোয়াট। নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসের কিতাবে সেগুলোর নামগন্ধও নেই। প্রমাণের জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীস ও ফিক্হের কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে। সেগুলোতে দুই ঈদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কথিত শ্রেষ্ঠ ঈদের আলোচনা কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই।

ঈদে মীলাদুন্নবীর সূচনা যেভাবে হয়

মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিবস উপলক্ষে 'ক্রিসমাস ডে' পালন করতো। তাদের সেই আড়ম্বরপূর্ণ জন্মোৎসবের জৌলুসে দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, এবং মুসলিম সমাজে খ্রিস্টানদের ন্যায় নবীর জন্ম উদযাপনের রেওয়াজ না থাকায় তারা এটাকে নিজেদের ত্রুটি হিসাবে সাব্যস্ত করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ইরাকের মুসেল নগরীতে, স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ মালিক মুযাফ্ফর আবূ সাঈদ কূকরী (মৃত ৬৩০হি.) ৬০৪ হিজরীতে সর্বপ্রথম এই ঈদে মীলদুন্নবীর সূচনা করে। এরপর তার দেখাদেখি অন্যরাও শুরু করে।

উক্ত বাদশাহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী লেখেন, সে একজন অপব্যয়ী বাদশাহ ছিলো। সে তার সমকালীন আলেমদের হুকুম দিতো, তারা যেন তাদের ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুযায়ী আমল করে এবং অন্য কারো মাযহাবের অনুসরণ না করে। ফলে দুনিয়া পূজারী একদল আলেম তার ভক্ত এবং দলভূক্ত হয়ে পড়ে।[১৬৫]

---

১৬৫. আল কাওলুল মু'তামাদ ফী আমলিল মাওলিদ, রাহে সুন্নাত সূত্রে,পৃষ্ঠা ১৬২

উক্ত অপব্যয়ী বাদশাহ প্রজাদের মনোরঞ্জন ও নিজের জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বছর ১২ই রবীউল আউয়ালকে কেন্দ্র করে মীলাদুন্নবী উদযাপন করতো। এ অনুষ্ঠানে সে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তিন লক্ষ দীনার ব্যয় করতো।[১৬৬]

অতঃপর দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলবী উমর ইবনে দেহইয়া আবুল খাত্তাব মীলাদ মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে দলীলাদি সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ-কড়ি হাতিয়ে নেয়। তার ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, সে আইম্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও গালিগালাজমূলক কথাবার্তা বলতো। সে দুষ্টভাষী, আহমক এবং অত্যন্ত অহংকারী ছিলো। আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলো চরম উদাসীন।[১৬৭]

তিনি আরো বলেন, আমি মানুষদেরকে তার ব্যাপারে মিথ্যা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ পেয়েছি।[১৬৮]

মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী

১. আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. ছিলেন মীলাদ উদ্ভবকালের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম। তিনি মীলাদের খণ্ডনে এক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটির নাম ‘আল মাওরিদ ফী কালামিল মাওলিদ’। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন-‘মীলাদের এই প্রথা কুরআন-হাদীসেও নেই। আর পূর্বসূরীদের থেকেও তা বর্ণিত নয়; বরং এটা একটা বিদ‘আত, যাকে বাতিলপন্থি ও স্বার্থপরগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। আর পেট পূজারীরা তা লালন করেছে’।[১৬৯]

২. আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. যাকে মীলাদের গোঁড়া সমর্থক মৌলভী আহমদ রেজা খাঁ বেরেলবী ‘ইমাম’ বলে আখ্যায়িত করেছে, তিনি ‘আল-মাদখাল’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন ‘লোকেরা যে সমস্ত বিদ‘আতকে ইবাদত মনে করে এবং এতে ইসলামের শান শওকত

---

১৬৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৩৯-১৪০
১৬৭. লিসানুল মিযান: ৪/২৯৬
১৬৮. লিসানুল মিযান: ৪/২৯০
১৬৯. বারাহীনে ক্বাতি‘আ; পৃষ্ঠা ১৬৪

প্রকাশ হয় বলে ধারণা করে, তন্মধ্যে রয়েছে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান। রবীউল আউয়াল মাসে বিশেষ করে এ আয়োজন করা হয়। বস্তুত এসব অনুষ্ঠান অনেক বিদ'আত ও হারাম কাজ সম্বলিত হয়'।[১৭০]

৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন- প্রচলিত এই মীলাদ অনুষ্ঠান সালাফে সালেহীনের যুগে ছিলো না। যদি এ কাজে কোন ফযীলত ও বরকত থাকত, তবে পূর্বসূরীরা আমাদের চেয়ে এই অনুষ্ঠানের বেশি হকদার ছিলেন, কারণ তারা নবী প্রেমে আমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী এবং ভাল কাজে অধিক আগ্রহী ছিলেন।[১৭১]

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. কে প্রশ্ন করা হয়, মীলাদ অনুষ্ঠান কি বিদ'আত? শরী'আতে এর কোন ভিত্তি আছে? জবাবে তিনি বলেন- মীলাদ অনুষ্ঠান মূলত বিদ'আত। তিন পবিত্র যুগের সালাফে সালিহীনের আমলে এর অস্তিত্ব ছিলো না।[১৭২]

৫. কুতবুল আলম রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এক প্রশ্নের জবাবে লেখেন- 'মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান সর্বাবস্থায় নাজায়েয।' অন্যত্র লেখেন- 'বর্তমান যুগের মাহফিলগুলো যথা মীলাদ, ওরশ, তিন দিনা, চল্লিশা সবই বর্জন করা দরকার। কেননা, এগুলোর কোনটাই গুনাহ ও বিদ'আত থেকে মুক্ত নয়'।[১৭৩]

৬. হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবীর যৌক্তিকতা খণ্ডনের পর লেখেন- 'মোটকথা, যুক্তি ও শরী'আত উভয় দিক দিয়ে প্রমাণিত হলো যে, এই নবোদ্ভাবিত 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নাজায়েয, বিদ'আত এবং পরিত্যাজ্য'।[১৭৪]

৭. সৌদি আরবের প্রধান মুফতী আল্লামা শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. এক প্রশ্নের জবাবে লেখেন- কুরআন সুন্নাহ ও অন্যান্য শর'ঈ দলীল মতে ঈদে মীলাদুন্নবীর আয়োজন অনুষ্ঠান ভিত্তিহীন, বরং বিদ'আত। এতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এসব অনুষ্ঠানে

---

১৭০. আল-মাদখাল ১/৯৮৫, আল-মিনহাজুল ওয়াযিহ; পৃষ্ঠা ২৫২
১৭১. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম; পৃষ্ঠা ২৬৫
১৭২. হিওয়ার মাআল মালিকী; পৃষ্ঠা ১৭৭
১৭৩. ফাতওয়া রশীদিয়া: ১৩১
১৭৪. আশরাফুল জওয়াব: ১৩৮

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

মুসলমানদের যোগদান করা নাজায়েয। কেননা, এর দ্বারা বিদ‘আত সম্প্রসারণের প্রতি উৎসাহ যোগানো হয়।[১৭৫]

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে শর‘ঈ দৃষ্টিতে দ্বীনের নামে এ জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করা মারাত্মক বিদ‘আত ও নাজায়েয; যা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী।

পবিত্র জুমু‘আর দিনের বিস্তারিত নির্দেশনা ও ফযীলত

জুমু‘আর দিনের শ্রেষ্ঠত্ব

হাদীস: হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনসমূহের মধ্যে জুমু‘আর দিন সর্বোত্তম। এই দিন হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে এবং এই দিন তাঁকে বেহেশত থেকে বের করে (পৃথিবীতে পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে এবং জুমু‘আর দিনই কিয়ামত কায়েম হবে।[১৭৬]

জুমু‘আর দিন গোসল করা

হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু‘আর নামাযে যায় সে যেন গোসল করে।[১৭৭]

জুমু‘আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা

হাদীস: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু‘আর দিন যেন প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি গোসল করে, মিসওয়াক করে এবং সামর্থ অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করে।[১৭৮]

জুমু‘আর নামাযের ফযীলত

---

১৭৫. মাজমাউল ফাতওয়া: ৪/২৮০
১৭৬. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫৪
১৭৭. সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৭৭, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৪৪
১৭৮. সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৮৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৪৬

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিন এলে মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেশেতাগণ বসে যান। তাঁরা একের পর এক আগমনকারীর নাম লিপিবদ্ধ করেন। যখন ইমাম (মিম্বরে) বসে পড়েন তখন তাঁরা নথিপত্র গুটিয়ে আলোচনা শোনার জন্য চলে আসেন। মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি উট দানকারীর সমতুল্য, তারপর আগমনকারী ব্যক্তি গরু দানকারীর সমতুল্য, তার পরের জন মেষ দানকারীর সমতুল্য, এর পরের জন মুরগী দানকারীর সমতুল্য এবং তারও পরে আগমনকারী ব্যক্তি ডিম দানকারীর সমতুল্য (সওয়াব লাভ করেন)।[১৭৯]

হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ফরয গোসলের মত ভালোভাবে গোসল করলো এবং নামাযের জন্য আগমন করলো, সে যেন একটি উট সদকা করলো। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করলো, সে যেন একটি গাভী সদকা করলো। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করলো, সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা সদকা করলো। যে চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করলো, সে যেন একটি মুরগী সদকা করলো। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করলো, সে যেন একটি ডিম সদকা করলো। এরপর যখন ইমাম খুতবা প্রদানের জন্য বের হন, তখন ফেরেশতাগণ খুতবা শোনার জন্য হাযির হয়ে যান।[১৮০]

হাদীসঃ হযরত আলী রাযি. একটি লম্বা হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম খুতবা দেয়া শুরু করলে যে ব্যক্তি চুপচাপ বসে শোনে সে দুইটি বিনিময় প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এত দূরে বসে যে, ইমামের খুতবা শুনতে পায় না, তবুও চুপ থাকে এবং অনর্থক কথা বা কাজ না করে, সে একটি বিনিময় প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এমন স্থানে বসে যেখান থেকে ইচ্ছা করলে ইমামের খুতবা শুনতে এবং তাঁকে দেখতে পায়, তবুও অনর্থক কথা বা কাজ করে এবং চুপ না থাকে, সে গুনাহগার হয়। হযরত আলী রাযি. বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনই বলতে শুনেছি।[১৮১]

---

১৭৯. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫০
১৮০. সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৮১
১৮১. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১০৫১

জুমু'আর দিনে ছয়টি আমলের বিশেষ ফযীলত

হাদীসঃ হযরত আউস ইবনে আউস রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের উদ্দেশ্যে ভালোভাবে গোসল করবে, ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে (আযানের অপেক্ষা না করে) মসজিদে যাবে, পায়ে হেঁটে যাবে, বাহনে আরোহণ করবে না, ইমামের কাছাকাছি বসবে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবে, (খুতবা চলাকালীন) কোন কথা বলবে না বা কাজ করবে না, সে জুমু'আর নামাযে (যাওয়া-আসার) পথে প্রতি কদমে এক বছরের নফল রোযা ও এক বছরের নফল নামাযের সওয়াব পাবে।[১৮২]

জুমু'আর নামাযে গুনাহ মাফ হয়

হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুমু'আর নামাযে এলো, তাউফীক অনুযায়ী নামায আদায় করলো, ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলো, এরপর ইমাম সাহেবের সাথে জুমু'আর নামায আদায় করলো, তার দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী দিনসমূহ এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[১৮৩]

হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান মধ্যকার সমস্ত গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।[১৮৪]

জুমু'আর নামায ত্যাগকারীর প্রতি সতর্কবাণী

হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ও হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মিম্বরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, মানুষ যেন জুমু'আর নামায ত্যাগ করা

---

১৮২. সহীহ ইবনে খুযাইমা; হাদীস ১৭৫৮, জামে' তিরমিযী; হাদীস ৪৯৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৪৫, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৮৪

১৮৩. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫৭

১৮৪. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৩৩

থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিবেন, এরপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১৮৫]

জুমু'আর নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসবে না

হাদীস: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কেউ যেন তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, আমি নাফে' রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য নামাযের ব্যাপারেও।[১৮৬]

হাদীস: হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে। বরং এটা বলতে পারে, জায়গা করে দাও।[১৮৭]

জুমু'আর দিন মসজিদে লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাবে না

হাদীস: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, জুমু'আর দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। সে লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে লাগলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বসে যাও। তুমি দেরী করে এসে লোকদের কষ্ট দিচ্ছ।[১৮৮]

খুতবার সময় ইমামের কাছাকাছি বসা

হাদীস: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যিকরের জায়গায় (জুমু'আর মসজিদ)

---

১৮৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৬৫
১৮৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৯১১
১৮৭. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৭৮
১৮৮. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১১১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১১১৫

হাযির হও এবং ইমামের কাছাকাছি বসো। কেননা যে দূরে দূরে থাকবে, সে জান্নাতী হলেও তার জান্নাতে প্রবেশ বিলম্বিত হবে।[১৮৯]

জুমু'আর দিন খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা

হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমামের খুতবা চলাকালে তুমি যদি তোমার সাথীকে বল, 'চুপ করো', তবে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে।[১৯০]

হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁরা ইমাম বের হয়ে আসার পর অর্থাৎ মিম্বরে বসার পর কথা বলা ও নামায পড়াকে মাকরূহ বলতেন।[১৯১]

জুমু'আর আগে চার রাক'আত সুন্নাত ও পরে চার রাক'আত সুন্নাত

হাদীসঃ হযরত আবূ আব্দুর রহমান সুলামী রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. আমাদেরকে জুমু'আর পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন।[১৯২]

হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর নামায পড়ে সে যেন জুমু'আর ফরযের পর চার রাক'আত নামায পড়ে।[১৯৩]

জুমু'আর পরে চার রাক'আত সুন্নাত পড়ে আরো দুই রাক'আত পড়া উচিত

হাদীসঃ হযরত আবূ আব্দুর রহমান সুলামী রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. যখন আমাদের মাঝে (হুকুমতের পক্ষ থেকে) এলেন, তখন তিনি জুমু'আর পরে চার রাক'আত পড়তেন। এরপর হযরত আলী রাযি. তাঁর খেলাফতকালে এসে জুমু'আর পরে দুই রাক'আত ও চার

---

১৮৯. সুনানে আবী দাউদ; হাদীস ১১০৮
১৯০. সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৩৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫১
১৯১. ত্বহাবী: ১/২৫৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হাদীস ৫১৭৫
১৯২. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হাদীস ৫৫২৫
১৯৩. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৮১

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

রাক'আত (মোট ছয় রাক'আত) পড়তে লাগলেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) এটা আমাদের কাছে ভালো লাগলো। ফলে আমরা এটা গ্রহণ করলাম।[১৯৪]

হাদীস : হযরত আলী রাযি. থেকে অপর রেওয়াতে আছে, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা জুমু'আর নামায পড়বে তারা যেন ছয় রাক'আত পড়ে।[১৯৫]

জুমু'আর দিন দু'আ কবুলের সময় কোন্‌টি?

হাদীস: হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, তখন কোন মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি নিজ হাত মুবারক দিয়ে ইশারা করলেন, সেই সময়টি অল্প।[১৯৬]

মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় আছে, সেই সময়টি হচ্ছে ইমামের (মিম্বরে) বসা থেকে নামায শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময়।[১৯৭]

তিরমিযীর একটি বর্ণনায় আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমু'আর দিনের যে সময়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ কবুলের আশা করা যায়। সে সময়টিকে তোমরা আসরের পর থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত তালাশ করো। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, জুমু'আর দিন কাঙ্ক্ষিত দু'আ কবুলের সময় আসরের পর এবং সূর্য হেলে যাওয়ার পর।[১৯৮]

জুমু'আর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করা

হাদীস: হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত

---

১৯৪. ত্বহাবী; হাদীস ১৯৮০
১৯৫. ত্বহাবী; হাদীস ১৯৭৮
১৯৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৩৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫২
১৯৭. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫৩
১৯৮. জামে' তিরমিযী; হাদীস ৪৮৯

করবে, দুই জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ে তাকে একটি আলোকিত নূর দেয়া হবে।[১৯৯]

হাদীস: হযরত আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাযত করবেন।[২০০]

জুমু'আর দিন বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়া

হাদীস: হযরত আউস ইবনে আউস রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এই দিনে হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁর ওফাত হয়, এই দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, এই দিন সব সৃষ্টিজীব বেহুঁশ হয়ে যাবে। কাজেই এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়ে থাকে। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দুরূদ আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে যখন আপনার দেহ মাটিতে মিশে যাবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহগুলোকে মাটির জন্য (বিনষ্ট করা) হারাম করে দিয়েছেন।[২০১]

জুমু'আর দিনের বিশেষ একটি দুরূদ শরীফ রয়েছে। আসরের নামাযের পর নিজ স্থানে বসে দুরূদ শরীফটি আশি বার পাঠ করা উচিত। যার ফযীলত এই যে, আমলকারীর আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত-বন্দেগীর সওয়াব লেখা হয় এবং আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[২০২] দুরূদটি হচ্ছে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

---

১৯৯. মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৩৯২

২০০. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮০৯

২০১. সুনানে আবী দাউদ; হাদীস ১০৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১০৮৫, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৭৪

২০২. আল কুরবাতু ইলা রব্বিল আলামীন বিস সলাতি আলান নাবিয়্যি সায়্যিদিল মুরসালীন, ইবনে বাশকুওয়াল; হাদীস ১০৬, ১১১

উল্লেখ্য, হাদীসটি যদিও দুর্বল রাবীর কারণে যয়ীফ। কিন্তু ফযীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার অবকাশ আছে। বিধায় আশা করা যায়, এই দুরূদ শরীফটি পাঠ করলে উক্ত সওয়াব পাওয়া যাবে।

মুসাফাহা এক হাতে করবো, নাকি দুই হাতে?

দুইজন মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তখন তারা একে অপরকে সালাম দেয়, সালামের পর মুসাফাহা করে। এটা যেমনিভাবে মুসলমানদের পরস্পর মুহাব্বত-ভালোবাসার নিদর্শন, তেমনিভাবে পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ ইত্যাদি দূর করার মাধ্যম।

মুসাফাহার ফযীলত একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

অর্থ: দু'জন মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে, তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[২০৩]

অন্য হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ

অর্থ: কোনো মুমিন বান্দা যখন আরেকজন মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে

এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা করে তখন তাদের উভয়ের (সগীরা) গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে যায় যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে।[২০৪]

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসাফাহার আমলটি নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন হয়ে আসছে। হযরত কাতাদা রহ. বলেন, 'আমি হযরত আনাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কি মুসাফাহার আমল ছিলো? তিনি বললেন, হ্যাঁ।' হযরত

---

২০৩. সুনানে আবি দাউদ; হাদীস ৫২১২
২০৪. আল মু'জামুল আউসাত লিত ত্বাবারানী; হাদীস ২৪৫

আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম রাযি. বলেন, ‘আমরা (একবার) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি হযরত উমর রাযি. এর হাত ধরে (মুসাফাহা কর) ছিলেন।[২০৫]

মুসাফাহা এর শাব্দিক ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি

মুসাফাহা (اَلْمُصَافَحَةُ) এটা আরবী শব্দ (صَفْحٌ) থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, পার্শ্ব, । (صَفْحَةُ الْوَرَقِ) অর্থাৎ কাগজের এক পাশ; পৃষ্ঠা। এমনিভাবে হাতের দু'টি দিক রয়েছে, তালুর দিক, উপরের দিক।

অতএব (صَافَحَهُ مُصَافَحَةً) এর অর্থ হলো, নিজের হাতের এক দিক অপরের হাতের আরেক দিকের সাথে মিলানো। এটা হলো অর্ধেক মুসাফাহা। অতঃপর যখন আরেক হাত রাখবে তখন প্রত্যেকের অপর হাত আরেকজনের অপর হাতের সাথে মিলে যাবে। এটা হলো পূর্ণ মুসাফাহা।

মুসাফাহার সঠিক পদ্ধতি হলো, উভয় হাতে মুসাফাহা করা। মুসাফাহার সময় প্রত্যেকের এক হাত অপর ব্যক্তির দুই হাতের মাঝে থাকবে। কেউ কেউ শুধু আঙ্গুল মিলিয়ে থাকেন, এটা ঠিক না।

হাদীসের আলোকে দুই হাতে মুসাফাহার দলীল

ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীর ৭৫৫ নম্বর পৃষ্ঠায় باب المصافحة নামে পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন। যাতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণনা এনেছেন,

عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ

অর্থাৎ ‘হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাশাহহুদ শেখালেন, এমতাবস্থায় যে আমার হাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাতের মাঝে ছিলো’।

এরপর ইমাম বুখারী রহ. باب الأخذ باليدين তথা ‘উভয় হাত ধরা’ নামে আরেকটি পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন। আর তাতে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মুসাফাহার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন যে, তারা উভয় হাতে মুসাফাহা করেছেন।

---

২০৫. সহীহ বুখারী, বাবুল মুসাফাহা; হাদীস ৬২৬৩, ৬২৬৪

অতঃপর উভয় হাতের মুসাফাহার দলীল হিসাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর উপরোক্ত বর্ণনাটি পূর্ণ সনদসহ এনেছেন যে, আমার হাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাতের মাঝে ছিলো।[২০৬]

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর দুই হাতের মাঝে ছিলো। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাতে মুসাফাহা করলে তাঁর কোন সাহাবী এক হাতে মুসাফাহা করতে পারেন না। কারণ তাঁরা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক ও কদমে কদমে তাঁর অনুসারী।

বিজ্ঞ আলেমগণ ভালভাবেই জানেন যে, ইমাম বুখারী রহ. এর এ বাবের দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উভয় হাতেই মুসাফাহা করতেন। আর পরবর্তীতেও উম্মতের মাঝে এ আমলই জারী ছিলো।

ইমাম বুখারী রহ. তার কিতাব 'আত তারীখুল কাবীরে' লেখেন,

اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفى، أبو الحسن : رأى حماد بن زيد، صافح ابنَ المبارك بكلتا يديه

অর্থাৎ ইসমাঈল (ইমাম বুখারী রহ. এর পিতা) ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ. কে দেখেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর সাথে উভয় হাতে মুসাফাহা করেছেন।[২০৭]

এখানে জ্ঞাতব্য যে, এই উভয় ব্যক্তিই স্বীয় যামানার মুহাদ্দিসীনে কেরামের ইমাম ছিলেন। ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন যে, '(হাদীস শাস্ত্রের) ইমাম হলেন চারজন। যথা, ১. মালেক রহ. ২. সুফিয়ান সাউরী রহ. ৩. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ. ও ৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.।'[২০৮]

অন্যান্য মুহাদ্দিসও উভয় হাতে মুসাফাহার কথা উল্লেখ করেছেন।

---

২০৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬২৬৫
২০৭. আত তারীখুল কাবীর: ১/৩৩২ [১০৮৪]
২০৮. তাযকিরাতুল হুফফায: ১/২০২

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে বললেন, قد بايعتك অর্থাৎ আমি তোমাকে বাই'আত করলাম। হযরত আয়িশা রাযি. বলেন যে, তাকে শুধু কথার দ্বারা বাই'আত করেছেন, হাত ধরে বাই'আত করেননি।[২০৯]

আল্লামা কস্তল্লানী রহ. ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হযরত আয়িশা রাযি. এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লেখেন,

ای لا باليد كما كان يبايع الرجال بالمصافحة باليدين

অর্থাৎ হাত দিয়ে বাই'আত করেননি, যেমন পুরুষদের বাই'আত করতেন উভয় হাতে দিয়ে মুসাফাহার মাধ্যমে।[২১০]

ফিকহের আলোকে দুই হাতে মুসাফাহার দলীল

মুহাদ্দিসীনে কেরামের সাথে সাথে ফুক্বাহায়ে কেরাম; যাদের অনুসরণ করার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তারাও উভয় হাতে মুসাফাহা করাকে সুন্নাত বলেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে শামীতে লেখেন, والسنة فيها ان تكون بكلتا اليدين অর্থাৎ মুসাফাহার সুন্নাত হলো, (মুসাফাহা) দুই হাতে হওয়া।[২১১]

এক হাতে মুসাফাহার প্রচলন

মুসলমানদের মাঝে উভয় হাতে মুসাফাহা করার পদ্ধতিটি উম্মাহর একটি নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা, যা যুগ পরম্পরায় স্বীকৃত। ইংরেজদের আমলের পূর্বে কোন ইসলামী গ্রন্থে দুই হাতে মুসাফাহা করাকে বিদ'আত বা সুন্নাতের খেলাফ বলে মন্তব্য করা হয়নি।

ইংরেজ আমলের শুরুর দিকেও মুসলমানরা পরস্পর সাক্ষাতের সময় দুই হাতে মুসাফাহা করতো। আর ইংরেজরা পরস্পর সাক্ষাতের সময় এক হাতে মুসাফাহা করতো, যাকে মূলত তারা হ্যান্ডশেক বলতো। ইংরেজদের এ প্রথাকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করে তৎকালীন আধুনিক শিক্ষিতরা। তারা কলেজ ভার্সিটিতে এক হাতে মুসাফাহা করার রেওয়াজ শুরু করে দেয়। অবশ্য

---

২০৯. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৭১৩
২১০. ইরশাদুস সারী: ৭/৩৮০-৪৮৯১, উমদাতুল ক্বারী: ১৯/২৩১-১৯৮৪
২১১. আদ দুর্‌রুল মুখতার: ৬/৩৮১

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

এটাকে তারা ইংরেজদের পদ্ধতিই মনে করতো। কিন্তু পরবর্তীতে সেসব আধুনিক শিক্ষিতদের তাকলীদ করে কথিত আহলে হাদীসরাও নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শুধু এক হাতে মুসাফাহা করার রীতি বের করে। কিন্তু পার্থক্য হলো কথিত আহলে হাদীসরা ইংরেজদের পদ্ধতিটিকে সুন্নাত সাব্যস্ত করে মুসলমানদের মাঝে যুগ যুগ ধরে উম্মাহর নিরবচ্ছিন্ন কর্ম পরম্পরায় চলে আসা দুই হাতে মুসাফাহার আমলী পদ্ধতিকে বিদ'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী বলে প্রচারণা শুরু করে দেয়। সেই সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী জামা'আতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিরোধী, সুন্নাত ধ্বংসকারী হিসাবে প্রচার করতে শুরু করে। মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ইসলামী পদ্ধতিটি মিটিয়ে দেয়াকে সুন্নাত জিন্দা করার নামে অভিহিত করতে থাকে। এভাবেই সালাম ও মুসাফাহা, যা এক সময় মুসলমানদের পরস্পর মুহাব্বত ও মাগফিরাতের মাধ্যম ছিলো, সেটা বিবাদ-ঝগড়া ও বিভক্তির মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একহাতে মুসাফাহা করার দলীলের পর্যালোচনা

একহাতে মুসাফাহা করার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কওল, ফে'ল কিংবা তাকরীর, সহীহ, হাসান অথবা যঈফ পর্যায়েরও কোনো হাদীস; হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আহলে হাদীসরা মুসাফাহা সম্পর্কে এ ধরণের হাদীস উপস্থাপন করতে আজ পর্যন্ত ব্যর্থ, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ব্যর্থই থাকবে।

তবে 'সালাম'-এর কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলোতে أخذ بيده، أخذ باليد অর্থাৎ 'হাত ধরেছেন' ইত্যাদি শব্দ এসেছে। আর يد শব্দটি এক বচন। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, এক হাতেই মুসাফাহা করা উচিত। এ সকল হাদীসগুলোকে আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুগণ এক হাতে মুসাফাহার দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন।

প্রিয় পাঠক! আহলে হাদীস বন্ধুদের এ বক্তব্য শুনে হাদীস সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়। দেখুন, মানুষের শরীরে কিছু অঙ্গ রয়েছে যেগুলো একাধিক। যেমন, দুই হাত, দুই পা, দুই কান, দুই চোখ ইত্যাদি। এক ধরণের হওয়ার কারণে পৃথিবীর সকল ভাষায় এগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এক বচনই ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হলো, 'আমি আপনাকে সেখানে স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি'। একথার দ্বারা কি কোন বেওকুফ একথা

বুঝবে যে, লোকটি কানা, তাই এখানে 'স্বচক্ষে' একবচন ব্যবহার করা হয়েছে? কখনো বলা হয় যে, 'আমি নিজ কানে তোমার কথা শুনেছি'। এর মানে কি লোকটি কথা শোনার সময় অপর কানটি বন্ধ করে রেখেছিলো? কেউ বললো, 'আমি আমার পা সেখানে রাখবো না'। এর মানে কি এটা যে, লোকটির একটিই পা?

আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

অর্থ: (কৃপণতাবশত) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখো না, যার ফলে তোমাকে নিন্দাযোগ্য ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হয়।[২১২]

এ আয়াতে কি এক হাতই উদ্দেশ্য? আর সে হাত কি ডান হাত?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দু'আ করতেন। আর অন্যদেরও শিখাতেন যে,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার চোখে নূর দাও! আমার কানে নূর দাও![২১৩]

তাহলে এ হাদীসে কি بصر ও سمع এক বচন ব্যবহার হওয়ার কারণে এক কান ও এক চোখ বোঝানো উদ্দেশ্য? কখনোই না। তাছাড়া বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ হাদীস-

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অর্থ: প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।[২১৪]

তেমনিভাবে মুসলিম শরীফের হাদীস-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

---

২১২ (সূরা ইসরা; আয়াত ২৯)
২১৩ (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৩৫)
২১৪ (সহীহ বুখারী; হাদীস ১০)

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ কাজ দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে।[২১৫]

এসব হাদীসে يد এক বচন আসায় কি এক হাতই উদ্দেশ্য? এক্ষেত্রেও কি অন্য হাত ব্যবহার করা সুন্নাতের খেলাফ হবে?

এরপরও তর্কের খাতিরে যদি মুসাফাহার হাদীসে يد (হাত) দ্বারা এক হাতই উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে আরবীতে يد শব্দতো আঙ্গুল থেকে নিয়ে কাঁধ পর্যন্ত পূর্ণ অংশকেই বোঝায়। এ অর্থ হিসাবে যদি মুসাফাহার সময় দুই ব্যক্তি পরস্পর কনিষ্ঠাঙ্গুল মিলায় বা উভয়ের বাম কাঁধ পরস্পর মিলায়, তাহলে কি এ হাদীসের উপর আমল হবে? এবং এটা কী মুসাফাহা গণ্য হবে? কিছুতেই হবে না?

যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, এখানে يد দ্বারা এক হাতই উদ্দেশ্য, তবুও উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল; যা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেটাকে বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নাত কিভাবে বলা যায়? দেখুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক কাপড়ে নামায আদায় করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল হলো তিন কাপড়ে নামায পড়া। উম্মতের এ নিরবচ্ছিন্ন আমলের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কাপড়ে নামায পড়ার হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে অন্য হাদীসের উপরও। আজ পর্যন্ত উম্মতের এ নিরবচ্ছিন্ন আমলকে কেউ খেলাফে সুন্নাত বলে মন্তব্য করেনি।

তেমনিভাবে উম্মতের মাঝে দুই হাতে মুসাফাহা করার যে নিরবচ্ছিন্ন আমল চলে আসছে, তাতে এক হাতে মুসাফাহা করার হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে দুই হাতে মুসাফাহা করার হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাচ্ছে। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কোন হাদীসের বিরোধিতা করার ভয় নেই।

যেমন, হাদীসে উযূর মধ্যে একবার করে অঙ্গ ধোয়ার কথা এসেছে, তেমনিভাবে দুইবার করে ধোয়ার হাদীসও রয়েছে, সেই সাথে তিনবার করে ধোয়ার হাদীসও বিদ্যমান। এখন যে ব্যক্তি তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করবে,

---

২১৫ (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৬)

সে তিন হাদীসের উপরই আমল করলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একবার করে অঙ্গ ধৌত করবে, সে সুনিশ্চিতভাবে দু'টি হাদীসের উপর আমল করেনি। এখন এই ব্যক্তি যদি এ প্রোপাগাণ্ডা শুরু করে যে, একবার করে অঙ্গ ধৌত করাই সুন্নাত, আর তিনবার করে ধৌত করা বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নাত, তাহলে এ মুর্খের ব্যাপারে যতই আফসোস করা হোক না কেন, তা কমই হবে।

মোটকথা, ইজমায়ে উম্মতের বিপরীতে কিছু নামধারী আহলে হাদীস শুধু নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা অনুসারে يد দ্বারা এক হাত উদ্দেশ্য নিয়েছে। যেখানে পুরো উম্মত يد দ্বারা এর জিন্‌স তথা হস্তসমূহ উদ্দেশ্য নিয়ে উভয় হাত উদ্দেশ্য নিয়েছে। শুধু তাই নয়, লা-মাযহাবীরা নিজেদের পক্ষ থেকে يد দ্বারা ডান হাতকে সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেই সাথে কেবলই নিজ মতের ভিত্তিতে দুই হাতে মুসাফাহা করার হাদীসকে শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং খেলাফে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছে।

পাঠক! তারা ডান হাতে মুসাফাহা করার বিষয়টি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কওল, ফেল বা তাক্বরীর, হাসান, সহীহ বা যঈফ কোন হাদীস দ্বারাই প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে আভিধানিক অর্থ দিয়ে দলীল পেশ করে থাকে। বলে যে, মুসাফাহা হাতের তালু মিলানোর নাম। আমরা বলবো, যদি দুই ব্যক্তি তাদের হাতের বাম তালু দিয়ে মুসাফাহা করে, তাহলে আভিধানিক অর্থে এটাও মুসাফাহা বলে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তারাও তো এটাকে মুসাফাহা বলে না।

অনেক আহলে হাদীস বন্ধু একথা বলে থাকে যে, 'যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাতে মুসাফাহা করেছিলেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তো এক হাতেই করেছেন। আর আমি তো নবী নই যে, উভয় হাতে মুসাফাহা করবো। আমি এখানে নবীর বদলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর অনুসরণ করি'। এর উত্তর হলো, যেমনিভাবে আপনি নবী নন, তেমনি ইবনে মাসউদ রাযি. এর মত সাহাবীও নন যে, এক হাতে মুসাফাহা করবেন। তাই আপনি এক আঙ্গুলের সাথে অন্য আঙ্গুল মিলিয়ে মুসাফাহা করবেন, যাতে আপনার নবী হওয়ারও কোন সন্দেহ না থাকে, আবার সাহাবী হওয়ারও কোন সম্ভাবনা না থাকে'!! আশ্চর্য! কোন হাদীসে তো 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. উভয় হাতে মুসাফাহা

করেননি’ একথা আসেনি। তাহলে কীভাবে বুঝলেন যে, তিনি এক হাতে মুসাফাহা করেছেন? তাছাড়া একথা কিছুতেই যৌক্তিক হতে পারে না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত মুবারক বাড়িয়েছেন। আর ইবনে মাসঊদ রাযি. কেবল এক হাত বাড়িয়েছেন! তিনি কখনো তথাকথিত আহলে হাদীসদের ন্যায় বেয়াদব ছিলেন না।

আসল কথা হলো, যখন কোনো ব্যক্তি উভয় হাতে মুসাফাহা করে, তখন এক হাতের উভয় পাশে অন্যজনের উভয় হাত লেগে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এক হাতের সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করছেন যে, আমার এ হাতের উভয় পাশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাত মুবারক লেগে ছিলো। নিজের অপর হাত লাগানো ছিলো না একথা বলেননি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন, সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

নামাযের বাইরে কোন্ সূরার শেষে কী পড়া সুন্নাত?

১. সূরা ফাতেহা শেষ করে বলবে آمِين ।[২১৬]
২. সূরা বাকারা শেষ করে বলবে **آمِين**।[২১৭]
৩. সূরা আর রহমানের প্রত্যেক فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এর পরে বলবে, لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ ।[২১৮]
৪. সূরা ক্বিয়ামাহ শেষ করে বলবে بَلَى ।[২১৯]
৫. সূরা মুরসালাত শেষ করে বলবে آمَنَّا بِاللَّهِ ।[২২০]

---

২১৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৮২
২১৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭৯৭৬
২১৮. জামে’ তিরমিযী; হাদীস ৩২৯১
২১৯. সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ৮৮৭
২২০. সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ৮৮৭

৬. সূরা শামস্ পড়ার সময় وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا পড়ার পর বলবে, اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا।[২২১]

৭. সূরা আ'লা পড়ার সময় سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পড়ার পর বলবে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى এরপর বাকি অংশ পড়বে।[২২২]

৮. সূরা তীন শেষ করে বলবে بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ।[২২৩]

মহিলাদের মসজিদে গমন নাজায়েয

দ্বীন নাযিল হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছরে, ধীরে ধীরে, বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে। এ কারণেই প্রাথমিক যুগের এমন অনেক হুকুম রয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে রহিত করে নতুন হুকুম দেয়া হয়েছে। কখনো আবার কোনো বিষয়ের অবকাশের গণ্ডি সীমিত করে তুলনামূলক কঠিন হুকুম দেয়া হয়েছে। প্রথম হুকুমটি যদিও হাদীসের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু সেগুলো উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়; বরং আমলযোগ্য হলো সুন্নাত তথা কোনো বিষয়ের সর্বশেষ হুকুম, যা সাধারণ অবস্থায় সকলের জন্য বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শুরু যুগে ইমাম সাহেব কোনে উযরের কারণে বসে নামায পড়ালে মুসল্লিদের মধ্যে যাদের কোনো উযর নেই- তাদেরও ইমামের অনুসরণে বসে নামায পড়ার বিধান ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন উযরের কারণে ইমাম সাহেব বসে পড়লেও মুসল্লিদের যাদের কোনো উযর নেই, তাদের জন্য বসে পড়া জায়েয নেই। কেননা, উম্মতের জন্য সর্বশেষ হুকুম হলো 'উযর না থাকলে দাঁড়িয়ে পড়া'। এখানে বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. এর বক্তব্যটি সবিশেষ লক্ষণীয়, তিনি বলেন,

قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فهو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

---

২২১. তাবারানী কাবীর; হাদীস ১১১৯১
২২২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৮৬৪৩
২২৩. সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ৮৮৭, জামে' তিরমিযী; হাদীস ৩৩৪৭

অর্থ: হুমাইদী (ইমাম বুখারী রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ) বলেন, নবীজীর এ নির্দেশ 'যখন ইমাম বসে নামায পড়ে, তখন তোমরাও (উযর না থাকলেও) বসে নামায পড়ো' এ বিধানটি ছিলো নবীজীর অসুস্থতার যামানার প্রাথমিক নির্দেশ। পরবর্তীতে নবীজী স্বয়ং বসে ইমাম হয়ে নামায পড়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম পিছনে দাঁড়িয়ে ইক্তেদা করেছেন! নবীজী তাদেরকে বসে নামায পড়ার আদেশ দেননি। আর নবীজীর সর্বশেষ আমলই গ্রহণযোগ্য।[২২৪]

একইভাবে মহিলাদের মসজিদে গমন করার বিষয়টিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনুমোদিত ছিলো। পরবর্তীতে সেটাকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। শুরু যুগে মহিলাদের মসজিদে আসার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, তার ভিত্তি ছিলো দু'টি জিনিসের উপর। **এক.** ইসলামের সূচনালগ্ন হওয়ায় দ্বীনী ইলমের ব্যাপক প্রচার প্রসারের স্বার্থে পুরুষ মহিলাসহ সকলের জন্য মসজিদে এসে সরাসরি নবীজীর কাছ থেকে হুকুম-আহকাম জানার প্রয়োজন। **দুই.** ফিতনার আশঙ্কা না থাকা।

কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে যখন দ্বীনী ইলমের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়ে গেলো অপরদিকে 'খাইরুল কুরুন' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগেই মহিলারা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে খুশবু ব্যবহার করে, সেজে-গুজে মসজিদে আসতে শুরু করলো, তখন ফিতনা ফাসাদের প্রবল আশঙ্কায় হযরত আয়িশা রাযি., উমর রাযি., ইবনে মাসঊদ রাযি.-সহ অনেক সাহাবায়ে কেরাম কঠোরভাবে মহিলাদের মসজিদে গমনকে নিষেধ করলেন তাঁরা নিজেদের এ নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে এ কথাও ঘোষণা করলেন যে, 'নবীজী যদি জীবিত থাকতেন, তবে তিনিও অবশ্যই এ পরিস্থিতিতে মহিলাদেরকে মসজিদে গমন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন'। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও মৌনভাবে তাদের এ নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করলেন। কেননা, এ নিষেধাজ্ঞা ছিলো, শরীআতের রুচিবোধ এবং নবীজীর মানশা ও ইচ্ছার সঠিক বাস্তবায়ন। সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে উলামায়ে পরবর্তী কেরাম এখনো মহিলাদের মসজিদে গমন করাকে নাজায়েয বলে থাকেন।

এখন আমরা কুরআন, হাদীস, সাহাবাদের আমল ও ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করবো যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হবে যে, বর্তমান যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামা'আতে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয।

---

২২৪. সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮৯

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

কুরআনে কারীমের আয়াত

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

অর্থ: তোমরা (নারীরা) তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং জাহিলিয়্যাত যুগের নারীদের মত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না।[২২৫]

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ...

অর্থাৎ তোমরা মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, তবে এমনিতেই যা প্রকাশ পেয়ে যায় (সেটার কথা ভিন্ন) এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় ...।[২২৬]

এই দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ঘরোয়া পরিবেশে পবিত্র জীবন যাপন করে এবং বেগানা পুরুষদের থেকে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে সংযত রাখে এবং জাহিলী যুগের নারীদের মত নিজের সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে না বেড়ায়। বর্তমান ফিতনা ফাসাদের ছড়াছড়ির যুগে ব্যাপকভাবে মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ায়, যার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। সে হিসাবে তাদের মসজিদে যাওয়া কখনো জায়েয হতে পারে না।

হাদীসের আলোকে মহিলাদের মসজিদে গমন

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারী আপাদমস্তক আবরণীয়। যখন সে

---

২২৫. সুরা আহযাব; আয়াত ৩৩
২২৬. সুরা নূর; আয়াত ৩০-৩১

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

বাইরে বের হয় শয়তান তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নারী যতক্ষণ ঘরের ভিতরে থাকে আল্লাহর রহমতে অধিক নিকটে থাকে।[২২৭]

২. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করেছে সে যেন আমাদের সাথে ইশার নামাযে শরীক না হয়।[২২৮]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলার জন্য ঘরের আঙ্গিনায় নামায অপেক্ষা তার ঘরে নামায পড়া উত্তম। আর ঘরে নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কোঠায় নামায পড়া উত্তম।[২২৯]

৪. একদা হযরত উম্মে হুমাইদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে নামায নামায পড়তে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালবাস। কিন্তু তোমার ঘরে নামায বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায তোমার বাড়ীতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়ীতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর উক্ত মহিলা নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করে নিলো এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করলো।[২৩০]

প্রথম হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নারীদের ব্যাপারে শরীআতের রুচিবোধ হলো যে, তারা ঘরে অবস্থান করবে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। দ্বিতীয় হাদীসে স্বয়ং নবীজী সুগন্ধি ব্যবহার করলে ফিতনা সৃষ্টি হবে এই আশঙ্কায় সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী মহিলা সাহাবীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। তৃতীয় হাদীসে সে আশঙ্কার বাস্তবায়িত হওয়ার

---

২২৭. জামে' তিরমিযী; হাদীস ১১৭৩, মুসনাদে বায্যার; হাদীস ২০৬১
২২৮. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯৯০
২২৯. সুনানে আবী দাউদ; হাদীস ৫৭০
২৩০. মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৭০৯০, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৬৮৯ ও সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ২২১৭

বিষয়টিই হযরত ইবনে উমর রাযি. উল্লেখ করেছেন। শেষোক্ত দু'টি হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদেরকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুৎসাহিত করেছেন এবং তাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন।

সারকথা, যে বিষয়টি শরীআতের রুচিবোধের বিপরীত বিষয়, নবীজী স্বয়ং যে বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছেন সে বিষয়টি কী করে বর্তমানে বৈধতার অনুমতি পেতে পারে।

মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান

১. হযরত আমর শাইবানী রহ. বলেন, আমি (এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহবিদ) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে দেখেছি, তিনি জুমু'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা ঘরে চলে যাও; তোমাদের জন্য এটাই উত্তম।

৫. হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন যে, মহিলারা (সাজ-সজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোশাক পরিধানে) কী পন্থা অবলম্বন করেছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিলো বনী ইসরাইলের মহিলাদেরকে।[২৩১]

আম্মাজান আয়িশা রাযি. একথা যখন বলছেন, তখন ছিলো 'খাইরুল কুরুন' তথা ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগের সময়কাল। তাবেয়ীগণের সাথে সাথে অনেক সাহাবীও তখন জীবিত ছিলেন। লক্ষ্যণীয় হলো, যে বিষয়টি 'খাইরুল কুরুন' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগেও নবীজীর অনুমোদন প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে না, চৌদ্দশ বছর পরে নৈতিক অবক্ষয়ের এ চরম দূর্যোগময় মুহূর্তে তা কীভাবে অনুমোদিত হতে পারে?

ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত

হানাফী মাযহাবঃ হানাফী মাযহাবে মহিলাদের জন্য যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা, ওয়াজ নসীহত শ্রবণ কিংবা নামাযের জন্য মসজিদে গমন বৈধ নয়।

---

২৩১. সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৬৯

আল্লামা হাসকাফী রহ. আদ্দুররুল মুখতারে (১/৫৬৬) বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

মালেকী মাযহাব: মালেকী মাযহাব মতে বৃদ্ধা মহিলা যাদের প্রতি সাধারণত পুরুষদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, তাদের জঁন্য পাচ ওয়াক্ত ফরয নামায, ঈদের নামায ও ইস্তিসকার নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েয আছে, তবে অনুত্তম। এমনিভাবে যুবতী মহিলা-যে সুন্দরী নয়- ফরয নামাযের জামা'আতে বা আত্মীয় স্বজনদের জানাযার নামাযে শরীক হতে মসজিদে আসতে পারে তবে। শর্ত হলো, সুগন্ধি ব্যবহার এবং সাজ-সজ্জা করবে না, ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না, সাধারণ কাপড় পরে বের হবে, পুরুষদের ভিড়ে পড়বেনা এবং রাস্তা বিপদ-আপদ মুক্ত থাকতে হবে। এ সকল শর্তের কোন একটি না পাওয়া গেলে মসজিদে যাওয়া হারাম। আর যুবতী নারী সুন্দরী হলে কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়।[২৩২]

শাফেয়ী মাযহাব: শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ বলেন, যদি সে যুবতী কিংবা তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এমন বৃদ্ধা হয় তাহলে তার জন্য এটা মাকরূহে তাহরীমী এবং তার স্বামী বা অন্যান্য অভিভাবকের জন্য তাকে সুযোগ দেয়াটাও মাকরূহে তাহরীমী হবে। তবে যদি এমন বৃদ্ধা হয় যে, তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না তাহলে তার মাকরূহ হবে না।

আল্লামা নববী রহ. শরহুল মুহায্যাব [২৩৩] গ্রন্থে 'শাফেয়ী মাযহাবে'র বিবরণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

হাম্বলী মাযহাব: হাম্বলী মাযহাব মতেও সর্বাবস্থায় মহিলার জন্য তাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম এবং যদি ফেতনার আশঙ্কা হয়, তবে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে।[২৩৪]

হুকুমের শর্তাবলীর ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মাযহাব চতুষ্টয়ের সারকথা হলো, 'মহিলাদের মসজিদে গমনের বৈধতার ক্ষেত্রে শর্ত হলো 'ফিতনার আশঙ্কা না থাকা'। আর বর্তমান যামানায় যেহেতু ফেতনা সৃষ্টির

---

২৩২. বিস্তারিত দেখুন আশ্‌শরহুল কাবীর লিদ্দারদীর ১/৩৩৬ (শামেলা সংস্করণ)
২৩৩. আল মাজমু' শরহুল মুহায্যাব, ইমাম নববী ৪/৬৮
২৩৪. বিস্তারিত দেখুন আররওযুল মুরবি; পৃষ্ঠা ৮৯, আল মুগনী ২/২৫০

আশঙ্কাই প্রবল এ কারণে হানাফী ফকীহগণ সর্বক্ষেত্রে সকল মহিলার জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়াকে নাজায়েয ফাতওয়া দিয়েছেন।

মহিলাদের মসজিদে গমন বৈধতা প্রসঙ্গে হাদীসের কয়েকটি বর্ণনা ও তার পর্যালোচনা

১. ইবনে উমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন তোমাদের মহিলারা মসজিদে যাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চায় তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিও।[২৩৫]

২. উম্মে আতিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমারী, যুবতী, পর্দাশীল এবং হায়েযা মহিলাদেরকে দুই ঈদে ঈদগাহে নিয়ে যেতেন। তবে হায়েযা মহিলারা ঈদগাহে আলাদা এক স্থানে অবস্থান করতো। তারা মুসলমানদের ওয়াজ-নসীহতে অংশ গ্রহণ করতো। এক মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কারো কাছে চাদরের ব্যবস্থা না থাকে? তিনি উত্তরে বললেন, তার কোন বোন যেন তাকে চাদর দিয়ে সহযোগিতা করে।[২৩৬]

পর্যালোচনা

মহিলাদের মসজিদে গমনের বৈধতা প্রসঙ্গে এ জাতীয় কিছু হাদীস যদিও হাদীসের কিতাবগুলোতে রয়েছে, তথাপি তা উম্মতের জন্য দু কারণে আমলযোগ্য নয়-

এক. বৈধতার হাদীসগুলো ইসলামের প্রাথমিক যামানার, পরবর্তীতে নবীজী স্বয়ং উম্মে হুমাইদ রাযি. কে মসজিদে আসতে নিরুৎসাহিত করে সে বৈধতাকে একপ্রকার নিষেধই করে দিয়েছেন।

দুই. বৈধতার ভিত্তি মৌলিকভাবে নামায পড়া ছিলো না, (এ কারণেই তো হায়েযা মহিলারাও ঈদগাহে যেতো। যদি নামায পড়াই মূল উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে তাদের সেখানে যাওয়ার কী অর্থ?) বরং এ বৈধতার ভিত্তি ছিলো 'মহিলারা যেন দ্বীনী ইলম শিখতে পারে', যা দ্বিতীয় হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে দ্বীনী ইলমের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের দরুন সে অবস্থা আর বাকী থাকেনি। উপরন্তু ফেতনার আশঙ্কাও ক্রমেই প্রবলতর হয়েছে। এ কারণেই আয়িশা রাযি. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম

---

২৩৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৪২
২৩৬. জামে' তিরমিযী; হাদীস ৫৩৯

কাঠোরভাবে মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়াকে নিষেধ করেছেন। অতএব এ সকল হাদীসকে ভিত্তি বানিয়ে ফিতনা-ফাসাদের এই যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে উৎসাহিত করার কোন সুযোগ নেই।

আর বর্তমানে হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত স্বতন্ত্রভাবে মসজিদে এসে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থাপনা নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো হজ্জ-উমরার আমল, যেমন তওয়াফ, সাঈ, যিয়ারত ইত্যাদি করতে এসে যদি নামাযের সময় হয়ে যায়, তবে যেন মা বোনদের নামায কাযা না হয়। অন্যথায় এ সকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধারণত দেখা যায় না তারা নিজেদের ঘরেই নামায পড়ে নেয়।

সারকথা, মহিলাদের মসজিদে গমনের নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে এমন কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকহী বর্ণনা নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী ফেকাহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন; বরং মহিলাদের মসজিদে গমনের বিষয়ে নবীজী সুস্পষ্ট অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গিও এ নিষেধাজ্ঞার স্বীকৃতি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কয়েকজন 'হাদীস অজ্ঞদের' বক্তব্যের কারণে এ নৈতিক অবক্ষয়ের চরম মুহূর্তে কী করে তা সওয়াব ও আগ্রহের কাজ হতে পারে? যে সকল আলেম বা স্কলারগণ বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন, তাঁরা কী রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আয়িশা রাযি. ও ইবনে মাসঊদ রাযি. এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশি যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন?

কাজেই যদি সুন্নাতের উপর আমল করতে হয় এবং আখেরাতে সওয়াব প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তবে মা-বোনদের উচিত ঘরেই নামায আদায় করা। আর তাদের পুরুষ অভিভাবকদেরও কর্তব্য এ ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাউফীক দান করুন। আমীন।

মু'আমালাত

বেচা-কেনা ও লেন-দেন সংক্রান্ত কিছু হাদীস

হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোযখে যাবে

হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইবনে উজরা রাযি. কে বলেছেন, হে কা'ব ইবনে উজরা! যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য দোযখই সমীচীন।[২৩৭]

যে সুদ খায় এবং যে সুদ দেয় উভয়েই গুনাহগার

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন যে সুদ খায় তার প্রতি, যে সুদ দেয় তার প্রতি, যে সুদের দলীল লেখে তার প্রতি, যে দু'জন সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেছেন, গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই সমান।[২৩৮]

একই বস্তু পরিমাপে কম-বেশি করা যাবে না

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা হযরত বেলাল রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বরনী (এক প্রকার খুরমা) নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রকার খুরমা কোত্থেকে পেলে? তিনি বললেন, আমার কাছে নিম্নমানের খুরমা ছিলো। আমি দুই সা' (প্রায় আট সের) নিম্নমানের খুরমা এক সা' (প্রায় চার সের) ভালো খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়ানোর জন্য। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহা! এ তো সুদী লেনদেন হয়ে গেল। আহা! এ তো সুদী লেনদেন হয়ে গেল। এমনটি করো না। বরং তুমি এই মন্দ খুরমা পরিমাণে বেশি দিয়ে কম পরিমাণে উত্তম খুরমা লাভ করতে

---

২৩৭. মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৪৪৪১, সুনানে দারেমী; হাদীস ২৮১৮, শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী; হাদীস ৮৯৫২

২৩৮. সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৮৯

চাইলে মুদ্রার বিনিময়ে মন্দ খুরমা ভিন্নভাবে বিক্রি করবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বেচা-কেনা করবে। এরপর সেই মুদ্রা দিয়ে উত্তম খুরমা কিনবে।[২৩৯]

ঋণগ্রহীতার কোন সুযোগ-সুবিধা ঋণদাতা নিতে পারবে না

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ধার দেয়, এরপর ধারগ্রহীতা ধারদাতাকে কোন হাদিয়া বা উপহার দেয়, তবে তা গ্রহণ করবে না। অথবা যদি গ্রহীতা ধারদাতাকে যানবাহনের উপর বসাতে চায়, তবে তার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ধার নেয়ার পূর্ব থেকে তাদের মধ্যে এরূপ আচরণ প্রচলিত থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।[২৪০]

ফল গাছে থাকতে বিক্রি নিষেধ

হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানার সূরতে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা খেজুরের মধ্যে এভাবে করা হয় যে, বাগানের গাছে খেজুর রয়েছে। অনুমান করা যে, বৃক্ষ থেকে ছিন্ন করে শুকালে এতে কী পরিমাণ খুরমা হবে? ঐ পরিমাণ খুরমা প্রদান করে তার বিনিময়ে বৃক্ষের খেজুর বৃক্ষে রেখে ক্রয় করা। মুযাবানা আঙ্গুরের মধ্যে এভাবে করা হয় যে, গাছে আঙ্গুর রয়েছে। অনুমান করা যে, শুকালে কী পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে? সে মতে মেপে ঐ পরিমাণ কিশমিশের বিনিময়ে গাছের আঙ্গুর ক্রয় করা। আর শস্যের মধ্যে এভাবে হয় যে, ক্ষেতে শস্য আছে। অনুমান করা যে, এতে খাদ্য কী পরিমাণ আছে? মেপে সে পরিমাণে ঐ জাতীয় খাদ্য প্রদান করে ক্ষেতের শস্য ক্রয় করা। এসব হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।[২৪১]

গাছের ফল খাওয়ার উপযোগী না হলে বিক্রি করা নিষেধ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল উপযোগী হওয়ার আগে তা ক্রয়-বিক্রয়

---

২৩৯. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৩১২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৯৪
২৪০. সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৪৩২, শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী; হাদীস ৫১৪৪
২৪১. সহীহ বুখারী; হাদীস ২২০৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৪২

করতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।[২৪২]

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে যতক্ষণ না তাতে লাল বা হলুদ রং আসে এবং গম-যব ইত্যাদি শিষ জাতীয় বস্তু যতক্ষণ পূর্ণ পেকে সাদা রংধারী না হয়ে যায় অর্থাৎ কোন প্রকার দূর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিক্রি করবে।[২৪৩]

গাছের ফল লাল হওয়ার আগে বিক্রি নিষেধ

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ফল লাল হওয়ার আগে বিক্রি করতে। তিনি বলেছেন, ফল পাকার আগে বিক্রি করার পর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট কোন দূর্যোগে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান বিক্রেতা কিসের বিনিময়ে ক্রেতা থেকে টাকা আদায় করবে?[২৪৪]

গাছের ফল অগ্রীম বিক্রি করা নিষেধ

হযরত জাবের রা, থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছরের জন্য অগ্রীম ফল বিক্রি করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছেন আহরণের আগে যা বিনষ্ট হয় তার মূল্য কর্তন করতে।[২৪৫]

অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন বাই'য়ে হাসাত (কাঁকর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়) করা থেকে এবং বাই'য়ে গারার (অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়) থেকে (যেমন পানির মধ্যে মাছ বিক্রি করা)।[২৪৬]

---

২৪২. সহীহ বুখারী; হাদীস ২১৯৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৩৪
২৪৩. সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৩৫
২৪৪. সহীহ বুখারী; হাদীস ২১৯৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৫৫
২৪৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৩৬
২৪৬. সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫১৩

যে বস্তু দখলে নেই তা বিক্রি করা নিষেধ

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন ঐ বস্তু বিক্রি করতে যা আমার দখলে বা মালিকানায় নেই।[২৪৭]

ত্রুটিপূর্ণ বস্তুর ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি নিষেধ

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ত্রুটিপূর্ণ বস্তুর ত্রুটি না জানিয়ে বিক্রি করবে, সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে এবং ফেরেশতাগণ তার প্রতি লা'নত এবং অভিশাপ দিবেন।[২৪৮]

তিনটি উপায়ে উপার্জন ঘৃণিত

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর বিক্রির মূল্য ঘৃণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘণ্য, রক্ত ব্যবসাও জঘণ্য।[২৪৯]

মদের বিষয়ে দশজনের প্রতি লা'নত

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ সংশ্লিষ্ট দশজনের প্রতি লা'নত করেছেন। ১. যে মদ তৈরি করে, ২. যে মদ তৈরির ফরমায়েশ দেয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার প্রতি মদ বহন করা হয়, ৬. যে মদ পান করায়, ৭. যে মদ বিক্রি করে, ৮. যে সেটার মূল্য ভোগ করে, ৯. যে মদ কেনে, ১০. যার জন্য মদ কেনা হয়।[২৫০]

ব্যবসার মধ্যে ক্রেতার প্রতি সহানুভূতি থাকলে মুক্তি লাভ হয়

হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির কাছে মালাকুল মউত রূহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি কোনো বিশেষ নেক আমল করেছ? সে বললো, আমার মনে নেই। বলা হলো, চিন্তা কর। সে বললো, এমন কোন কাজই মনে আসে না একটি কাজ

---

২৪৭. জামে' তিরমিযী; হাদীস ১২৩৩
২৪৮. সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২২৪৭
২৪৯. সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৬৮
২৫০. জামে' তিরমিযী; হাদীস ১২৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৩৮০

ব্যতীত যে, দুনিয়ার জীবনে আমি আমার লোকদেরকে ক্রেতার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে নির্দেশ দিতাম। আমার ক্রেতা ধনী হলেও তাকে সময় দিতাম। আর যদি সে গরীব হত, তাকে আমার প্রাপ্য মাফ করে দিতাম। এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশত দান করেছেন।[২৫১]

কসম করে মাল বিক্রি করলে বরকত কমে যায়

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অধিক কসম খাওয়ায় মালের কাটতি বাড়ে। তবে বরকত দূর হয়ে যায়।[২৫২]

আমানতদার ও সৎ ব্যবসায়ীগণ নবী ও সিদ্দীকগণের দলভুক্ত

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যবাদী, আমানতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।[২৫৩]

---

২৫১. সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৪৫১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৬০

২৫২. সহীহ বুখারী; হাদীস ১৯৮১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৬০৬

২৫৩. জামে' তিরমিযী; হাদীস ১২২৭, সুনানে দারেমী; হাদীস ২৫৩৯, সুনানে দারা কুতনী; হাদীস ১৭,১৮। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন (২১৩৯)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ।

মু'আশারাত

সাধারণ মুসলমানদের হকসমূহ

- মুসলমান ভাইয়ের ভুল-ক্রুটি ক্ষমা করবে।
- সে কাঁদলে তার প্রতি দয়া করবে।
- তার দোষ-ক্রুটি গোপন করবে। ইসলাহের জন্য বলতে হলে গোপনে বলবে।
- তার ওজর-আপত্তি মেনে নিবে।
- তার কষ্ট লাঘব করবে।
- সব সময় তার কল্যাণ কামনা করবে।
- তার দেখাশোনা করবে ও তাকে ভালোবাসবে।
- তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে ছাড় দিবে।
- অসুস্থ হলে সেবা–শুশ্রুষা করবে।
- মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় অংশ নিবে।
- তার দা'ওয়াত কবুল করবে। কোন বিষয়ে সাহায্য চাইলে তাউফীক থাকলে সাহায্য করবে।
- ওজর না থাকলে তার হাদিয়া কবুল করবে।
- তার সদাচরণের প্রতিদান দিবে।
- তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে।
- প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করবে।
- তার পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবে।
- তার অভাব মোচন করবে।
- তার ভালো আবেদন পূরণ করবে।
- তার বৈধ সুপারিশ গ্রহণ করবে।
- তার বৈধ আশা পূরণ করবে।
- সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে।
- তার হারানো জিনিস পেলে তার কাছে পৌঁছে দিবে।

- তার সালামের উত্তর তাকে শুনিয়ে দিবে।
- নম্রতার সাথে ও হাসিমুখে তার সাথে কথা বলবে।
- তার প্রতি সদাচরণ করবে।
- তোমার উপর ভরসা করে কসম খেলে তা পূরণ করবে।
- তার উপর কেউ জুলুম করলে তাকে সাহায্য করবে। সে কারো উপর জুলুম করলে তাকে বাধা দিবে।
- তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে। শত্রুতা করবে না।
- তাকে লাঞ্ছিত করবে না। যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করো, তা তার জন্যও পছন্দ করবে।[২৫৪]
- সাক্ষাত হলে সালাম করবে, সম্ভব হলে মুসাফাহা করবে।[২৫৫]
- ঘটনাচক্রে পরস্পরে মনোমালিন্য হলে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখবে না।[২৫৬]
- তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না।[২৫৭]
- তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে না।[২৫৮]
- সামর্থানুযায়ী সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।[২৫৯]
- ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবে।[২৬০]
- দু'জন মুসলমানের মাঝে কলহ হলে তাদেরকে পরস্পরে মিলিয়ে দিবে।[২৬১]
- তার গীবত করবে না।[২৬২]

---

২৫৪. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম আসবাহানী র.; হাদীস ১১৭০
২৫৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৬২, সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ৫২১১
২৫৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬০৬৫
২৫৭. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬০৬৬, তাবারানী কাবীর: ২৩/১৫৬ [২৩৯]
২৫৮. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬০৬৫
২৫৯. সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৮, জামে' তিরমিযী; হাদীস ২১৫৯
২৬০. জামে' তিরমিযী; হাদীস ৪৯৪৩
২৬১. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৯৮৯, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৬৪০
২৬২. সূরা হুজুরাত; আয়াত ১২, সহীহ বুখারী; হাদীস ৬০৫২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৮৯

- তার ধন সম্পদ বা মান-সম্মানের কোন ক্ষতি করবে না।[২৬৩]
- যদি বাহনে আরোহণ করতে না পারে বা বাহনের উপর সামানাপত্র উঠাতে না পারে, তাহলে তার সহায়তা করবে।[২৬৪]
- তাকে তুলে দিয়ে তার স্থানে বসবে না।[২৬৫]
- তৃতীয় ব্যক্তিকে একা ছেড়ে দু'জনে কথা বলবে না।[২৬৬]

মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার

সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহারের অধিকারী হলেন মা

হাদীস : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছ থেকে উত্তম আচরণ লাভের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তরে বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা। তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজন।[২৬৭]

পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে

আয়াত: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি– (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে– তুমি শোকর আদায় কর

---

২৬৩. সহীহ বুখারী; হাদীস ১৭৩৯, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৬৪
২৬৪. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৯৮৯, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০০৯
২৬৫. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬২৬৯
২৬৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ৬২৮৮
২৬৭. সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৪৮

আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে। তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে।[২৬৮]

হাদীস: হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে সন্ধির সময় আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ। আমি কি তাঁর সাথে সদাচরণ করব? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তাঁর সাথে সদাচরণ করো।[২৬৯]

অক্ষম পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সন্তানের উপর ফরয

হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাও।[২৭০]

পিতা-মাতার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলবে না

আয়াত: তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কোরো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোন একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার

---

২৬৮. সূরা লুকমান; আয়াত ১৪, ১৫
২৬৯. সহীহ বুখারী; হাদীস ৩১৮৩, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০০৩
২৭০. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৫৩০

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।[২৭১]

হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়। ফলে ঐ ব্যক্তি পাল্টা তার পিতাকে গালি দেয়। সে অন্যের মাকে গালি দেয়। ফলে ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।[২৭২]

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ

হাদীস: হযরত মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদেরকে জীবন্ত দাফন করা, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক প্রশ্ন ও সম্পদ অপচয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন।[২৭৩]

মৃত্যুর পরে পিতা-মাতার কয়েকটি হক

হাদীস: হযরত আবূ উসাইদ সাঈদী রাযি. বলেন, একদা আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম এমতাবস্থায় বনী সালামার এক লোক এলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের সাথে সদাচরণ করার কিছু বাকী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।[২৭৪]

---

২৭১. সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত ২৩, ২৪
২৭২. সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৭৩, সহীহ মুসলিম: ৯০
২৭৩. সহীহ বুখারী; হাদীস ২৪০৮, সহীহ মুসলিম: ৫৯৩
২৭৪. সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫১৪২, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৬৬৪

হাদীস: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম নেক কাজ হলো পিতার অবর্তমানে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা।[২৭৫]

স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের ফযীলত

হাদীস: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।[২৭৬]

হাদীস: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ এবং রহমান। আমি রেহেম (আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। যে তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।'[২৭৭]

আত্মীয়তা ছিন্ন করা কাফেরদের স্বভাব

আয়াত: যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং আখেরাতে নিকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।[২৭৮]

আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণাম

হাদীস: হযরত যুবাইর ইবনে মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২৭৯]

---

২৭৫. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৫২
২৭৬. সহীহ বুখারী; হাদীস ২০৬৭, সহীহ মুসলিম: ২৫৫৭
২৭৭. জামে' তিরমিযী; হাদীস ১৯০৭
২৭৮. সূরা রা'দ; আয়াত ২৫
২৭৯. সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৮৪, সহীহ মুসলিম: ২৫৫৬

হাদীস: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ এবং রহমান। আমি রেহেম (আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। যে তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।[২৮০]

হাদীস: হযরত আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (খলীফাতুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহকারী এবং আত্মীয়তা ছিন্নকারী এর সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে প্রস্তুতকৃত শাস্তির সাথে সাথে দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করবেন।[২৮১]

সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে

হাদীস: হযরত ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদান স্বরূপ আত্মীয়তা রক্ষা করে, সে প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা হলেও পুনরায় তা স্থাপন করে।[২৮২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতা

হাদীস: হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কিছু আত্মীয় এমন আছে, যাদের সাথে আমি সম্পর্ক জুড়ে রাখি। কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি। কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করি। কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা প্রদর্শন করে। (এ কথা শুনে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বললে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ

---

২৮০. জামে' তিরমিযী; হাদীস ১৯০৭
২৮১. জামে' তিরমিযী; হাদীস ২৫১১
২৮২. সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৯১

তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকবে, সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে।[২৮৩]

২৮৩. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৫৪

আখলাক

যে সকল বিষয়ে মুসলমানরা কাফেরদের অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হয়

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে প্রেরণের সাথে সাথে হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন অসংখ্য কিতাব। পাঠিয়েছেন তাঁর মনোনীত অসংখ্য নবী-রাসূল আ.। সে হিসাবে আমাদের পবিত্র কুরআন হচ্ছে আমাদের কিতাব এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আমাদের রাসূল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[২৮৪] বাস্তবিক পক্ষেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের সফলতা ও কল্যাণ। তিনি আমাদেরকে কোন জাতির করুণার উপর ছেড়ে যাননি। বরং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন উন্নত আদর্শ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আজ মুসলিম জাতি তাদের স্বকীয়তা ভুলে গিয়ে বিজাতিদের অনুসরণে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, পার্থক্য করারও উপায় নেই যে, তারা কোন্ জাতি? অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।[২৮৫]

---

২৮৪. সূরা আহযাব; আয়াত ২১
২৮৫. সূরা মায়েদা; আয়াত ৫১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে হাশরের ময়দানে সে তাদের সাথেই থাকবে।[২৮৬]

সম্মানিত পাঠক! আমরা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইয়াহুদী-নাসারাদের অনুসরণ করছি তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে পেশ করা হলো, যেন আমরা তা থেকে বিরত থাকতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণ করার তাউফীক দান করুন এবং বিধর্মীদের অনুসরণ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

মুসলমান পুরুষরা যে সকল বিষয়ে কাফের মুশরিকদের অনুসরণ করছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

- কোট-প্যান্ট ও টাই পরা।
- টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা।
- পাঞ্জাবির সাথে ওড়না পরা।
- হাফপ্যান্ট পরা।
- ধুতি পরিধান করা।
- হাতে চুড়ি জাতীয় বস্তু পরা।
- স্বর্ণের অলংকার ও আসবাব-পত্র ব্যবহার করা।
- অভিনেতা বা সেলিব্রেটিদের স্টাইলে চুল কাটা।
- দাড়ি মুণ্ডানো বা স্টাইল করে কাটা এবং মোচ বড় রাখা।
- দাঁড়িয়ে পেশাব করা।
- বিবাহের পূর্বে 'গার্লফ্রেন্ড' বানানো।
- গলায় চেইন পরাসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

আমাদের মুসলমান মা বোনেরা যে সকল বিষয়ে কাফের মুশরিকদের অনুসরণ করছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- টাইটফিট কাপড় ও পাতলা কাপড় পরা।
- চুড়ি না পরা এবং হাতে মেহেদী না দেয়া।

---

২৮৬. মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৫১১৫

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

- কপালে টিপ দেয়া।
- অফিস, ব্যাংক ও মার্কেটের রিসিপশনের দায়িত্ব পালন করা।
- পুরুষদের সঙ্গে চাকরী করা।
- পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়া।
- বিবাহের পূর্বে 'বয়ফ্রেন্ড' বানানো।
- পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতঃ তাদের মত প্যান্ট-শার্ট পরা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরী রাখা, চুলে বব কাটিং দেয়া।
- নখ বড় রাখা।

শ্রেণীবিশেষের এ অনুকরণের পাশাপাশি সম্মিলিত মুসলিম সমাজও আজ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এ সকল বিভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি বিভ্রান্তি হলো-

- একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া বা খাওয়ার অভ্যাস করা।
- বাম হাতে খাওয়া বা পান করা।
- চামচের প্রয়োজন নেই- এমন জায়গায় চামচ দিয়ে খাওয়া।
- খাবারের শেষে প্লেট চেটে খাওয়াকে অভদ্রতা মনে করা এবং প্লেটে খাবারের কিছু অংশ রেখেই উঠে যাওয়া।
- অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড় ও সঙ্গীত শিল্পীদের ছবিওয়ালা গেঞ্জি বা শার্ট পরিধান করা।
- বেপর্দা ও গান-বাজনাসহ বিবাহের অনুষ্ঠান করা।
- বিয়েতে গায়ে হলুদ ও 'বধূবরণ' অনুষ্ঠান করা।
- ক্রুশের ছবিওয়ালা পণ্য ব্যবহার করা।
- শখ করে কুকুর পালা।
- শোক প্রকাশে নীরবতা পালন করা।
- মাযারে বা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।
- মাযারে মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা করা। ফুল দেয়া, সিজদা করা, মান্নত করা, প্রার্থনা করা।
- বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়া। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো।

- মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা।
- জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, শোক দিবস, বার্থডে, ম্যারেজ ডে, থার্টিফার্স্ট নাইট, পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ, ভালোবাসা দিবস, হোলি উৎসব ইত্যাদি পালন করা।
- ঘরে-বাইরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভাস্কর্য বা মূর্তি স্থাপন করা বা সাজিয়ে রাখা।
- আল্লাহ না বলে 'সৃষ্টিকর্তা', 'গড', 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' বলা।
- বিশেষ কোন উপলক্ষে কেক কাটা ও উইশ করা। হাই-হ্যালো, ওকে, টাটা, গুডবাই, গুডমর্নিং ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সাক্ষাত ও বিদায়ী সম্ভাষণ জানানো। মুসাফাহার পরিবর্তে 'হ্যান্ডশেক' করা।
- বড় ভাইকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করা।
- সন্তানকে 'বেবি কেয়ারে' রেখে আসা। বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো।
- ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দ্বীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা। সহশিক্ষা গ্রহণ করা।

আপনার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন!
তাদের আখলাক-চরিত্র হেফাযতে সহায়ক হোন!

সচেতন পিতা-মাতার পরিচয় হলো, সন্তানের সার্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পিতা-মাতার অসচেতনতা, অদূরদর্শীতা এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন সন্তানদের দুনিয়া-আখেরাত সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশঃ দ্বীন-ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং প্রযুক্তির সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে আখলাক-চরিত্র সব খোয়াতে বসেছে। এসব কিছুর পিছনে যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো, সন্তানদেরকে সময়মত বিয়ে না দেয়া। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দেয়া। ছেলেদের দাড়ি গজানোর দ্বারা আর মেয়েদের ঋতুবতী হওয়ার দ্বারা পিতা-মাতাকে এ কথা বোঝানো হয় যে, তাদের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, আর দেরী করা যাবে না। অতএব

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দু-এক বছরের মধ্যেই তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য।

এরপরও যদি বিয়ে না দেয়া হয়, আর একারণে ছেলে-মেয়ে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, অন্য কারো সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, ইন্টারনেটে অশ্লীল ছবি দেখে, তাহলে এ গুনাহের দায়দায়িত্ব পিতা-মাতার উপরও বর্তাবে। হাদীস শরীফে আছে,

من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه

সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো তার সুন্দর নাম রাখা এবং দ্বীন শিক্ষা দেয়া, আর বালেগ হয়ে গেলে বিবাহ করিয়ে দেয়া। যদি বালেগ হওয়ার পরও বিবাহ না করায়। আর সন্তান কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে এর দায়ভার পিতার উপরই বর্তাবে।[২৮৭]

অন্য একটি হাদীসে আছে, পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক হলো, সুন্দর নাম রাখা, আকীকা করা, দ্বীন শিক্ষা দেয়া, বালেগ হওয়ার পর বিয়ে দেয়া।[২৮৮] কাজেই পিতা মাতার দায়িত্ব শেষ হবে সন্তানকে বিয়ে দেয়ার পর।[২৮৯]

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজ মুসলিম উম্মাহ ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের নানামুখি ষড়যন্ত্রের শিকার। এদেশে যত এন.জি.ও আছে, এর অধিকাংশই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের অর্থে পরিচালিত। তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় সরকারকে দিয়ে এ আইন পাশ করিয়েছে যে, ১৮ বছরের আগে কোন মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না। তাদের ভাষায় এটা হলো 'বাল্যবিবাহ'। অথচ মেয়েরা সাধারণত আরো চার/পাঁচ বছর আগেই বালেগা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, 'এই আইনটা ১৬ বছরে করা হোক। কারণ মেয়েরা এতটা সময় (১৮ বছর) বসে থাকে না। পারিপার্শ্বিকতাসহ বিভিন্ন কারণে তাদের পক্ষে চারিত্রিক পবিত্রতা ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না।

---

২৮৭. সুনানে বায়হাকী; হাদীস ৮২৯৯
২৮৮. কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ; হাদীস ১৫৫
২৮৯. আওলাদ কো মুসলমান বানানে কা তরীকা, ২৭৩

বন্ধু-বান্ধবের হাত ধরে চলে যায়, নানা অঘটন ঘটায়।’ কিন্তু এনজিওদের হৈচৈয়ের কারণে সেটা আর সম্ভবপর হয়নি। এনজিওরা এই আইনটি পাশ করিয়েছে মূলত যিনা-ব্যভিচারকে ব্যাপক করার জন্য। এর জন্য তারা মুড়ি-মুড়কির মতো দেদারসে জন্মবিরতিকরণ ট্যাবলেট ও বিভিন্ন উপকরণ সাপ্লাই দেয়। এরপরও কোন মেয়ে যদি বিপদে পড়ে যায়, পেটে অবৈধ সন্তান চলে আসে- এর জন্য তারা ‘মেরী স্টোপস’ প্রতিষ্ঠা করেছে, যার কাজ হলো, মাতৃসেবার ছদ্মনামে অবৈধ গর্ভপাতের নিরাপদ আলয় তৈরি করা। আর মুসলমানরা মনে করছে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ওরা কত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে![২৯০]

অপর দিকে এনজিওরা জনসাধারণের মস্তিষ্কে বিভ্রান্তির এক ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, আঠারো বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেয়া যাবে না। আর বাপ-মা খাড়া করেছে দুই ভূত-

(ক) একটি হলো, পড়াশুনা শেষ করা, চাকরী ঠিক হওয়া। অনেক সময় দেখা যায় তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটি বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে প্রস্তাব দেয়– আব্বা! আমি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করছি। আর বাপ-মা বলে, তোর এখনো লেখা-পড়াই শেষ হয়নি, বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কোত্থেকে? এর উত্তরে আমরা বলবো, কেন, সে কি পড়াশুনার পাশাপাশি দু-একটা টিউশনি করে কিছু রোজগার করতে পারবে না? যদি না-ও পারে তাহলে আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেই গেছেন, طعام الواحد يكفي الإثنين (একজনের খাবার দু’জনের জন্য যথেষ্ট)। দু’জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট।[২৯১]

আপনার ফ্যামিলিতে দু-চারজন সদস্য অবশ্যই আছে, আরেক জন এলে কি তার জন্য ব্যবস্থা হবে না? অবশ্যই হবে। তাই পড়ালেখা শেষ হওয়ার দরকার নেই। বালেগ হলেই বিয়ে দিয়ে দিন। রিযিকের মালিক আল্লাহ।

(খ) দ্বিতীয় ভূত হলো সিরিয়াল রক্ষা করা। যেমন, এক ছেলে দ্বীনদার আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যায়। সে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করতে

---

২৯০. হামারে আয়েলী মাসায়েল, ১৬০

২৯১. সহীহ মুসলিম; হাদীস ২০৫৯

চায়, কিন্তু সিরিয়ালে তিন নম্বর। অর্থাৎ তার আগে আরো দু'জন রয়ে গেছে। তখন বাবা-মা বলে, আরে! তোর আগে তো আরো দু'জন রয়ে গেছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে তোকে বিয়ে করাব কিভাবে?

প্রিয় পাঠক! শরী'আতে কোন সিরিয়াল নেই। যার যখন পাত্র/পাত্রী পাওয়া যাবে, বিয়ে দিতে হবে। এর বড় দলীল হলো, হযরত মূসা আ. যখন ফিরাউনের রাজত্ব থেকে সঙ্গোপনে হযরত শু'আইব আ. এর দেশে হিজরত করলেন। আর শু'আইব আ. তার কন্যাদের কাছ থেকে হযরত মূসা আ. এর দ্বীনদারীর বর্ণনা শুনলেন যে, আসার সময় কন্যারা যখন তার আগে আগে চলে তাকে রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন মূসা আ. তাদেরকে বলেছেন, তোমরা আমার পিছন পিছন আসো এবং পিছন থেকেই রাস্তা বাতলে দাও। এতে হযরত শু'আইব আ. বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বড় কিছু হবেন। তখন তিনি হযরত মূসা আ. কে প্রস্তাব পেশ করলেন– আমার দুই মেয়ের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিব।[২৯২]

দেখুন, তিনি বলেছেন– احدى ابنتيّ هتين 'আমার এই দুই মেয়ের কোন একজন'। একথা বলেননি, বড়জনকে বিয়ে দিব, বরং বলেছেন, দু'জনের যাকে তোমার পছন্দ হয়...।

অথচ আমাদের দেশে সিরিয়াল রক্ষা করাকে জরুরী মনে করা হয়। ফলে সিরিয়াল ভেঙ্গে কেউই ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।

এভাবে সময়মত বিয়ে-শাদী না দেয়ার কারণে আজ আমাদের ছেলে-মেয়েরা বখে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে যত পাপাচার আছে সেগুলো দেখে দেহ-মন সব নষ্ট করে ফেলছে। কাজেই সচেতন অভিভাবকদের বলছি, আপনারা আপনাদের ছেলে-মেয়েকে গুনাহ থেকে বাঁচান। মোবাইল, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকেও বাঁচান এবং সময়মতো বিবাহ দিয়ে তাদেরকে গুনাহমুক্ত ইসলামী যিন্দেগী যাপনের সুযোগ করে দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহজ সরল ও পাপমুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

২৯২. সূরা ক্বাসাস; আয়াত ২৭

দা’ওয়াত

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মদদপুষ্ট এনজিওদের দ্বারা ইসলাম ও বাংলাদেশের যে সকল ক্ষতির আশঙ্কা!

ভারতবর্ষের উলামা ও মুসলমানদের আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসনের ইতি হয়। এরপর বাংলাদেশে ইংরেজরা কৌশল পরিবর্তন করে শিক্ষা ও সেবার ছদ্মাবরণে কাজ শুরু করে। বিশেষত মুসলিম জনসংখ্যাবহুল এই দেশে জনগণের নিরক্ষরতা ও দারিদ্রকে অবলম্বন করে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে দেশ ও জাতি শত্রুদের গভীর চক্রান্তের শিকার হয়ে চরম সংকটের মুখে পতিত হতে যাচ্ছে। জাতিকে সতর্ক করার জন্য নিম্নে তাদের কিছু উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরা হলো-

১. মুসলমানদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্ম বিরতিকরণ পিল, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় উপকরণ বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে। সুখী পরিবারের স্লোগান দিয়ে এক/দু'টির বেশি সন্তান না নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। যাতে যিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা সীমিত থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার গযব তরান্বিত হয়।

২. বাচ্চাদেরকে কুরআনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য কিন্ডারগার্টেনের নামে খুব সকালেই তাদেরকে ঘর থেকে বের করে স্কুলমুখী করছে।

৩. শিক্ষার্থীদেরকে সেক্যুলার বানানোর জন্য ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে।

৪. মা-বোনদেরকে নির্লজ্জ ও বেহায়া বানানোর জন্য সমঅধিকার, স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বী হবার মধুর স্লোগান দিয়ে অফিস-আদালত, গার্মেন্টস ও হাট-বাজারের সর্বত্র নারীর অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছে। এতে অনেক পাপাচার সংঘটিত হচ্ছে। অনেকেই ইজ্জত-সম্মান ও প্রাণ হারাচ্ছে।

৫. সীমান্ত ও দারিদ্রপ্রধান এলাকাগুলোতে বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা, খাদ্য ও বাসস্থান প্রদানের চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে

ধর্মান্তকরণের কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঈমানহারা হয়ে গেছে এবং এ ধারা চালু আছে।

৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য চড়া সুদে ঋণ দিচ্ছে এবং মোবাইল কোম্পানীগুলোর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে এবং তাদের বিলবোর্ড ও গভীর রাত্রের সুযোগ-সুবিধার কারণে যুবক-যুবতীরা চরিত্রহীন হয়ে পড়ছে।

৭. মাদরাসা শিক্ষার মূলধারাকে নষ্ট করে পারদর্শী ও হক্কানী আলেম তৈরির রাস্তা বন্ধ করার জন্য সরকারকে দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করে স্বীকৃতির নামে তা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

৮. তরুণ-তরুণীদের মাঝে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরি করার জন্য সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

৯. বিবাহের আগে যুবক-যুবতীদের মেলামেশা নিরাপদ করার জন্য মোড়ে মোড়ে স্বাস্থ্যসেবার নামে 'মেরি স্টোপস' প্রতিষ্ঠা করেছে।

১০. আল্লাহ তা'আলার গযবকে তরান্বিত করার জন্য 'এইডস প্রতিরোধে'র ছদ্মাবরণে অভিশপ্ত সমকামিতাকে ব্যাপক করছে।

১১. বাংলাদেশকে একটি খ্রিস্টানরাজ্যে পরিণত করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল স্তরে তারা নিজেদের সমমনা লোক বসিয়েছে, যারা ক্ষমতার জোরে তাদের দেয়া (ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী) এজেন্ডা (পরিকল্পনাগুলো) ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক বাস্তবায়ন করে চলেছে।

১২. পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীনে বড় বড় হাসপাতাল তৈরি করে সাগর পথে অস্ত্র আমদানী করে মজুত করার নিরাপদ পথ তৈরি করেছে, যা দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

১৩. আকাশপথে বাংলাদেশের প্রধান প্রবেশদ্বার হযরত শাহ জালাল রহ. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভীনদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে অবৈধ সরঞ্জাম আমদানীর পথকে সুগম করছে।

১৪. তারা যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে আবারো এ দেশের ক্ষমতার মসনদে বসার স্বপ্ন দেখছে, তাই নিজেদের চলাফেরা নির্বিঘ্ন করার জন্য সারা দেশে, এমনকি ধানক্ষেতে, অলি-গলিতে রাস্তা তৈরি করছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট, ব্রীজ ও ফ্লাইওভার নির্মাণ করছে। কিন্তু এগুলোর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য কাউকে বুঝতে দেয়া হচ্ছে না। বরং এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, এটা দেশের উন্নতি সাধন।

১৫. পর্যায়ক্রমে কাফেরদের কৃষ্টি-কালচার একটার পর একটা জারি করে এ দেশের মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান ধ্বংস করছে। পহেলা বৈশাখের পূজা, হোলি ইত্যাদি দিন দিন ব্যাপক করা হচ্ছে। মুসলমানদের ছেলে-মেয়েরা 'ভালোবাসা দিবস' পালন করে চরম বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার পরিচয় দিচ্ছে।

সারকথা, মৌলিকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দ্বীনী শিক্ষার বিলুপ্তিকরণ, সেক্যুলার শিক্ষার প্রচলন, ধর্মান্তকরণ, অর্থনৈতিক শোষণ, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপক করণ ও বাংলাদেশকে একটি খ্রিস্টানরাজ্যে পরিণত করণের লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছে। অতএব, সংকটাপন্ন এ দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করতে হলে দা'ওয়াত ও তা'লীমের মেহনতের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সুরক্ষায় মেহনত-মুজাহাদা করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

জনগণকে দ্বীনদার বানানোর মাদরাসা ভিত্তিক কর্মসূচী

মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ বিশেষত জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষা সমাপনকারী উলামায়ে কেরাম মাদরাসার পার্শ্ববর্তী জনসাধারণকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দ্বীনদার বানানোর ফিকির করবেন।

১. মাদরাসায় প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট তারিখে দা'ওয়াতুল হকের মাসিক ইজতিমা করা। কেন্দ্রের পক্ষ হতে মাদরাসা এলাকায় প্রতি মাসে চারটি গাশতী মাহফিল করা। প্রতি ছয় মাসে একবার আঞ্চলিক উলামা

সম্মেলনের আয়োজন করা। মাদরাসার সকল ছুটির সময় ছাত্রদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দ্বীনী কাজের প্রোগ্রাম দেয়া এবং মাদরাসা খোলার পর তাদের কাছ থেকে শ্রেণী ভিত্তিক লিখিত ও মৌখিক কারগুযারী গ্রহণ করা।

২. প্রতি বৃহস্পতিবার দরসের পর থেকে শুক্রবার আসরের পূর্ব পর্যন্ত তালিবে ইলমদের চব্বিশ ঘণ্টার জামা'আত বের করা। প্রতিদিন বা'দ ইশা হায়াতুস সাহাবা অথবা হেকায়াতে সাহাবা থেকে তা'লীম করা। প্রতি ছুটিতে ছাত্র-শিক্ষকদের কমপক্ষে তিনদিনের জন্য দা'ওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে বের হওয়া এবং দীর্ঘ ছুটিতে চিল্লার জন্য তাশকীল করা।

৩. মাদরাসার পার্শ্ববর্তী মহল্লাগুলো উস্তাদগণের মধ্যে ভাগ করে দেয়া। তাঁরা সম্ভব হলে প্রতিদিন, অন্তত সপ্তাহে তিনদিন নিজ মহল্লায় গিয়ে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা দ্বীনী তা'লীম করবেন।

৪. প্রত্যেক মাদরাসায় তিন মাসের দ্বীনী তা'লীমের কোর্স চালু করা। এই কোর্সে জনসাধারণকে কুরআনের বিশুদ্ধ তা'লীম ও দীনের জরুরী ইলম শিক্ষা দেয়া হবে।

৫. প্রত্যেক মাদরাসায় ইসলামী পাঠাগার চালু করা। এই পাঠাগারে দেওবন্দী আকাবির ও হক্কানী উলামায়ে কেরামের রচিত গ্রন্থাবলী একাধিক কপি করে রাখা হবে। একজন উস্তাদকে এর তদারকির দায়িত্ব দেয়া হবে। তিনি নির্দিষ্ট খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে জনগণের মাঝে বই/কিতাব বিতরণ করবেন এবং পাঠ শেষে তা উসুল করবেন। তাছাড়া কেউ দ্বীনী বই কিনে সংগ্রহ করতে চাইলে এই পাঠাগারে তারও ব্যবস্থা রাখা হবে।

৬. প্রত্যেক মাদরাসায় ফাতাওয়া বিভাগ চালু করা। এ বিভাগ থেকে জনগণকে জরুরী মাসাইলের সমাধান দেয়া। এ কাজে কোন বিজ্ঞ মুফতী সাহেবকে দায়িত্ব প্রদান করা।

বি.দ্র. উল্লিখিত কাজগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করা। দায়িত্বশীলগণ তিন মাস পরপর নিজ নিজ কাজের অগ্রগতির লিখিত রিপোর্ট পেশ করবেন।

এভাবে কাজ করলে আশা করা যায়, জনগণের প্রতি মাদরাসাওয়ালাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য তার বেশির ভাগই পালন হবে ইনশাআল্লাহ।